মূল নথি থেকে
ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
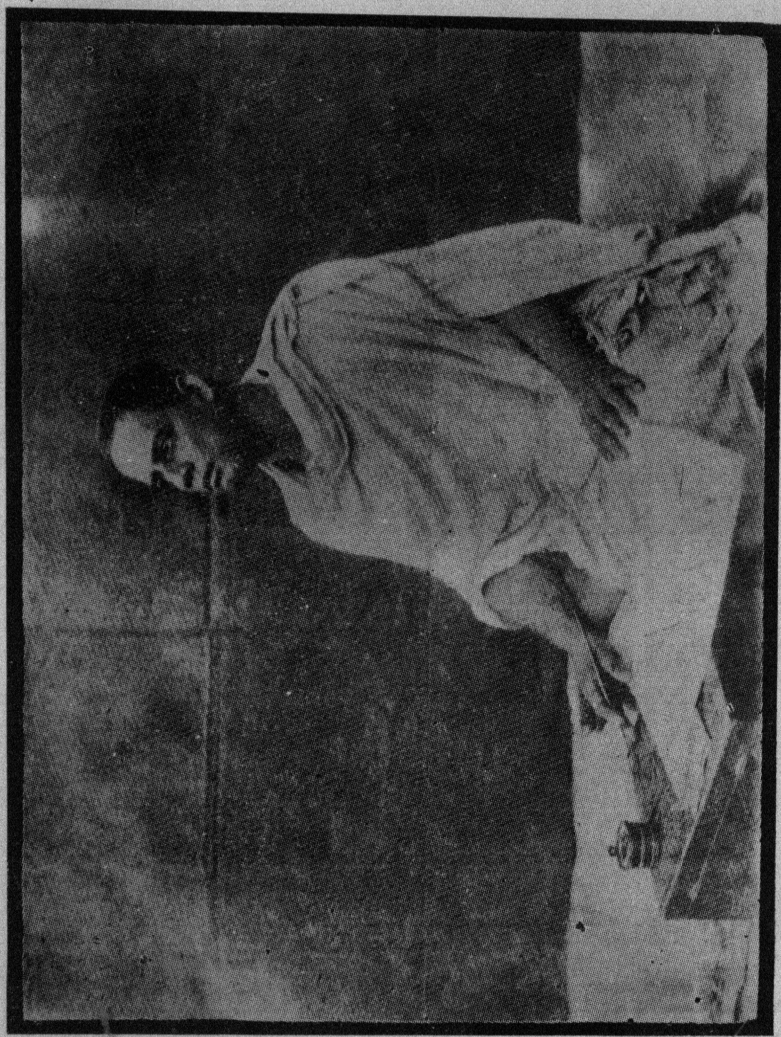
শ্রী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
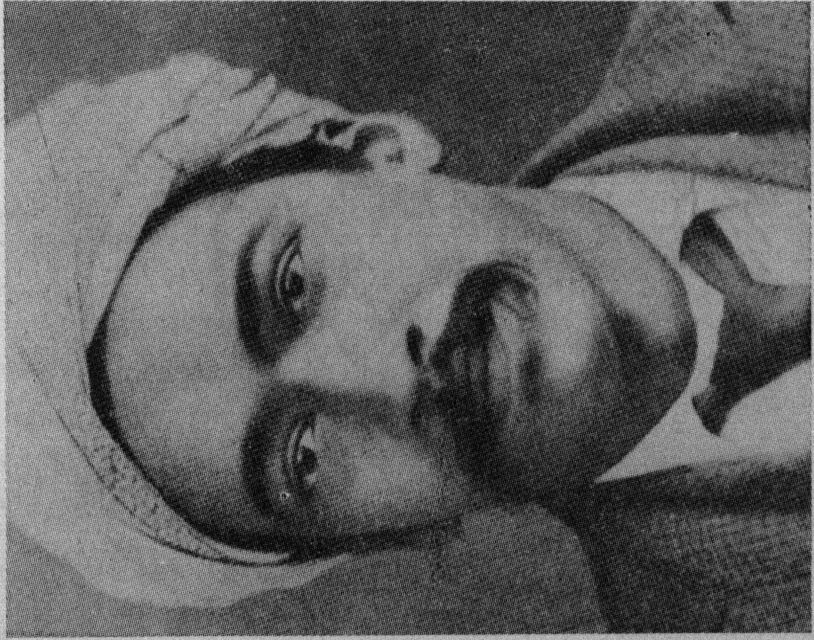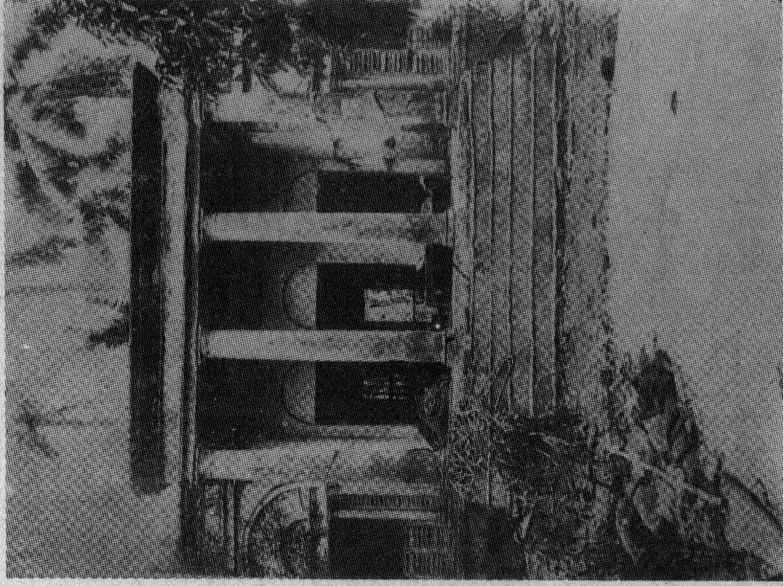
শ্রী অরবিন্দ ঘোষ।

শ্রী অরবিন্দের মুরারীপুকুরে পৈতৃক বাগানবাড়ি।

I believe that the above statement was voluntarily made. It is a full and complete ~~statement~~ reproduction of the statement made by the accused.

শ্রী ক্ষুদিরাম বসু
1-5-08

H. Woodman
Dist. Magte.
1. 5. 08

Read over and admitted correct in my presence

[illegible] 1. 5

Signed in my presence
[illegible] Kercher
Asst. Magte.
2/5/08.

ক্ষুদিরামের মামলার মূল নথি দেখতে দেখতে 'রাজাবাজার বোমা মামলার' মূল নথিটিও হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

রাজাবাজার বোমা মামলায় প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে ঢাকা শক্তি লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত 'শক্তি সঙ্গীত' নামক কাব্যগ্রন্থ। (কাব্যগ্রন্থের দুটি গান।)

প্রথমটি

"(তোরা) জাগরে, জাগরে, জাগরে হিন্দু মুসলমান,
আট কোটি ভাই।
উঠায়ে ধ্বজা, কাঁসী শাঁখ বাজা, মায়ের পূজায় চলরে যাই।।
আয় না সকলে জাতি ভেদ ভুলে,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রে মিলে,
হিন্দু মুসলমান আয়রে সকলে,
নব উদ্যমে চলরে ধাই।
আযরে তোবা পাবশী খ্রীষ্টান,
তোরাও আয়রে ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, জৈন;
সহস্র কণ্ঠে তুলি সমতান, বন্দেমাতরম্ গাইরে ভাই।"

দ্বিতীয় গানটিতে ছিল রামপ্রসাদী সুর।

"বল মা মোদের গতি কি হবে?
যদি রইলি ভু'লে সুত সবে।
সন্তানের দৈন্য মাগো! — মা বিনে আর, কে ঘুচাবে।
আমরা অন্নাভাবে মরি অন্ন দে গো!
তুমি বিনে কে অন্ন দিবে।
তোমার অন্ন ভাণ্ডার শূন্য করে মা!
নিলগো শ্বেত পঙ্গ সবে।
তুমি বিহঙ্গ হয়ে, পঙ্গ তাড়াও,
মোরা সুখে অন্ন খাইগো সবে।
এত অন্ন তোর ঘরে থাকতে মা!
অনাহারে কি মরব সবে?
(তুমি) আপন ছেলে ফেলে, পরকে খাওয়াও,
বিমাতা তোমায় বলব সবে।"

॥ ১ ॥

পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সব বিপ্লবী যুবক সশস্ত্র আন্দোলনে শামিল হয়ে মাতৃভূমি থেকে ইংরেজ প্রশাসনকে তাড়াতে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে এনে আদালতের বিচারে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব দানা বেঁধে উঠছিল।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল কলকাতা থেকে। 'বন্দেমাতরম্' ছিল ইংরেজি পত্রিকা। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজি স্বদেশী পত্রিকাটির সম্পাদক। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগচি ছিলেন পত্রিকার ম্যানেজার আর শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোস ছিলেন মুদ্রাকর।

১৯০৭ সালে স্বদেশীদের মদত ও ইংরেজ সরকারকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়নের অভিযোগে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায়। গ্রেপ্তার করা হল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগচি ও মুদ্রাকর শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে। মামলাটির বিচার হয়েছিল কলকাতার তদানীন্তন চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। ১৯০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মামলাটির রায় দেওয়া হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগচি মামলাটির অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ নেওয়া হয়েছিল ১৯০৭ সালের ১০, ১৩, ১৬ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর। বিচারাধীন অবস্থায় কি ভাবে যেন এই মামলাটির নামকরণ হয়ে গিয়েছিল—"বন্দেমাতরম্ কেস"।

মামলাটি চলাকালীন অবস্থায় আদালতে খুব ভিড় হত। হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে একটি কিশোর যার নাম ছিল সুশীল সেন আদালত কক্ষেই স্লোগান দিয়ে উঠল—'বন্দেমাতরম্'। স্লোগান দেওয়া কিশোরটিকে ইংরেজ প্রশাসনের পুলিশ আদালত চত্বর থেকেই ধরে আনল। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত মারা হল। একটি কিশোরের ওপর সর্বসমক্ষে ঐরূপ পৈশাচিক দণ্ডাদেশ দেওয়ার জন্য বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতি স্থির কবল জীবননাশের দ্বারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের অমানুষিকতার প্রতিশোধ নিতে হবে।

ইংরেজ প্রশাসনের কাছে গুপ্ত খবর পৌঁছে গিয়েছিল, বিপ্লবীরা কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। কিংসফোর্ডকে আর চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কলকাতায় রাখা ঠিক হবে না বলে ইংরেজ প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিল। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডকে বদলি করা হল মজঃফরপুরের জেলা জজ্ হিসেবে। কিংস্‌ফোর্ডও অবস্থা বুঝে চলে গেলেন তাঁর নতুন কর্মস্থলে।

অনুশীলন সমিতির সভ্যরা ও সমর্থক বিপ্লবী যুবক কিশোররাও খোঁজ খবর রাখছিলেন মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের গতিবিধির। সাহেবের বদলি হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে হত্যা করার জন্য মজঃফরপুরে গিয়েছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। অনেকেই জানেন না—বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ছদ্মনাম নিয়েছিলেন মজঃফরপুরে। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'দীনেশচন্দ্র রায়'।

মজঃফরপুরের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

ক্ষুদিরামের মামলার মূল নথিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আলিপুর জজ কোর্টে তৈরি 'স্মরণীয় বিচার সংগ্রহ' শালায়। এই বিচার সংগ্রহশালাটি তৈরি হয়েছে ঋষি অরবিন্দের যে বিচারকক্ষটিতে বিচার হয়েছিল সেই কক্ষটিকে কেন্দ্র করে। 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায়' অন্যান্য আরো ৩৫ জন অভিযুক্ত আসামীর সাথে শ্রীঅরবিন্দকেও দাঁড়াতে হয়েছিল আদালতের একই কাঠগড়ায়।

বেশ কিছু বিপ্লবী-মামলার মূল নথি খুব যত্ন সহকারে একাধিক কাচের

বাক্সে সাজিয়ে রাখা হয়েছে স্মরণীয় বিচার সংগ্রহশালায়। কোন বাক্সে কোন মামলার নথি রয়েছে তারও তালিকা রয়েছে বাক্সগুলির মাথায়। তাছাড়া আলাদা একটি তালিকাও ছাপানো হয়েছে মামলাগুলির নাম দিয়ে।

শৈশব থেকে শুনে এসেছি বিপ্লবী যুবক ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা। ১৯০৮ সালের ঘটনা। কোনোদিন সেই স্মরণীয় মামলাটির মূল নথিটি দেখার সৌভাগ্য হবে ভাবতেও পারিনি। ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশটি স্বচক্ষে দেখার জন্য ছুটে গিয়েছিলাম—আলিপুরে স্মরণীয় বিচার সংগ্রহশালায়।

বিচার সংগ্রহশালায় ঢুকতে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল দেওয়ালে গাঁথা একটি শাদা মারবেল ফলক। ফলকটিতে কালো অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—

In this room was held in 1908-1909
The Historic Trail of Fighters
For India's Emancipation including
SRI AUROBINDO
The Prophet of life Divine
"He will be looked upon as the poet of Patriotism; The prophet of Nationalism And the lover of Humanity. His words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across the Distant seas and lands.

Sri Chitta Ranjan Das
Council for the defence.

বাংলায় ভাবানুবাদ করলে বলা যায়— ১৯০৮-১৯০৯ সালে এই কক্ষটিতে বিচার হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক মুক্তিযোদ্ধাদের মামলাটির। এই মামলাটিতে অভিযুক্ত হয়ে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ-সহ আরো অন্যান্য মুক্তি সংগ্রামের যোদ্ধারা, যাঁরা মাতৃভূমির উত্তরণ চেয়েছিলেন। সেই উত্তরণ ছিল—দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তি।

শ্রী অরবিন্দ

আধ্যাত্মিক জীবন গুরু।

তিনি ছিলেন বিপ্লবী কবি, মাতৃমন্ত্রের সাধক। জাতীয়তাবাদী শিক্ষক। মানব অধিকারের প্রেমিক। তাঁর সেই মুক্তিমন্ত্রের বাণী শুধু ভারতবর্ষের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না, তা ছড়িয়ে পড়বে আসমুদ্র হিমাচলে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

আসামী পক্ষের আইনজীবী।

১৯০৭। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছিলেন স্বদেশী ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরমের' সম্পাদক। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে শ্রীঅরবিন্দকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগচি ও শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মামলাটি শুনানির জন্য উঠেছিল তদানীন্তন কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের আদালতে। সাক্ষ্য-সাবুদ নিয়ে মামলার রায় হয়েছিল ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে। এই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শ্রীবিপিনচন্দ্র পালকে সমন করা হয়েছিল। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে আদালত অবমাননার জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যখন 'বন্দেমাতরম্' মামলাটির শুনানি চলছিল সেই সময় সুশীল সেন নামক একটি বালক আদালতকক্ষেই হঠাৎ বন্দেমাতরম্ স্লোগান দিয়ে উঠেছিল। বালক সুশীল সেনকে ধরে আনা হয় মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের কাছে। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ কিংস্‌ফোর্ড সাহেব সুশীলকে ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। একটি বালককে এই ধরনের অমানুষিক দণ্ড দেওয়ায় বিপ্লবী দলের সদস্যরা খেপে উঠেছিলেন, চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—যে ভাবেই হোক কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যা করে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

বৃটিশ প্রশাসনের গুপ্তচররা বিপ্লবী দলের এই পরিকল্পনার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। প্রশাসন খানিকটা বিপ্লবীদের অগ্নিরোষকে ভয় পেল। বুঝতে পারল কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে এই অবস্থায় কলকাতায় রাখা ঠিক হবে না। তাঁকে মজঃফরপুরের জেলা দায়রা জজ্‌ করে বদলি করে দেওয়া হল।

কিংস্‌ফোর্ড সাহেব দমবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর কানেও বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। গেলে কী হবে! তিনি বদলি হওয়ার আগে 'বন্দেমাতরম্‌' মামলার অভিযুক্ত আসামী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগচিকে মুক্তি দিলেও পত্রিকার মুদ্রাকর শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত করে গেলেন।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বদলির খবর। সিদ্ধান্ত হয়েছিল মজঃফরপুরেই কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করা হবে।

নির্মমতার প্রতীক কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যা করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে। মজঃফরপুর যাত্রার আগে তাঁদের মাথায় হাত দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁদের আশীর্বাদ করেছিলেন।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী এই দায়িত্ব খুশির সাথে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। যাত্রা হল শুরু। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী সম্ভবত ২৫ কিংবা ২৬ এপ্রিল মজঃফরপুরে এসে পৌঁছেছিলেন। কারো কারো মতে তাঁরা মজঃফরপুরে এসেছিলেন ১০ এপ্রিল নাগাদ। উঠেছিলেন সেখানকার এক মেস্‌-বাড়িতে।

স্মরণীয় বিচার সংগ্রহের দৌলতে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মামলার মূল নথিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কি ভাবে মুজঃফরপুর দায়রা আদালতের মূল হাতে লেখা নথিটি আলিপুরে এসেছিল তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। শুনেছিলাম ১৯০৮ সালের আদালতের মূল নথিটি নাকি আলিপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে পাওয়া গিয়েছে।

বিচার সংগ্রহের ৫নং ও ৬নং কাচের বাক্স দুটিতে রাখা হয়েছে ক্ষুদিরামের মামলার নথি, আদালতে পেশ করা চিঠিপত্র ও প্রফুল্ল চাকী সম্বন্ধীয় নানা কাগজপত্র।

৫নং ও ৬নং বাক্সে রাখা কাগজপত্রের তালিকাও দেওয়া হয়েছে।

৫নং বাক্সে রয়েছে—

এ) মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও কিশোরীমোহন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আনীত নথি।

বি) মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও কিশোরীমোহন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আনীত 'কিংস্‌ফোর্ড হত্যা প্রয়াস'—মামলার নথি।

সি) 'কিংসফোর্ড হত্যা প্রয়াস' মামলার নিদর্শন হিসাবে ব্যবহৃত অকুস্থলের মানচিত্র।

ডি) ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব ছবি (সম্মুখভাগস্থ)।

ই) ২৩-৫-১৯০৮ তারিখে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রদত্ত ক্ষুদিরামের বিবৃতি।

এফ) ২-৫-১৯০৮ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রদত্ত ক্ষুদিরামের বিবৃতি।

জি) 'কিংস্‌ফোর্ড হত্যা প্রয়াস' মামলায় অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ।

এইচ) ভক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিলকৃত মামলার রায়।

আই) 'বন্দেমাতরম্‌' শীর্ষক প্রচার পত্র।

জে) ক্ষুদিরাম বসুর বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলা আদালতে ১৯০৬ সালে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলার নথি।

৬ নং কাচের বাক্সে রয়েছে—

এ) ক্ষুদিরাম বসুর বিরুদ্ধে আনীত মামলার নথিপত্র।

বি) ক্ষুদিরাম বসুর বিরুদ্ধে আনীত মামলার নথিপত্র।

সি) ক্ষুদিরাম বসুর বিরুদ্ধে আনীত মামলার নথিপত্র।

ডি) প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহ শনাক্তকরণ বিষয়ে ক্ষুদিরাম বসুর বিবৃতি।

ই) ক্ষুদিরামের ধরা পড়ার সংবাদ।

এফ) মোকামা স্টেশন থেকে প্রফুল্ল চাকীর বিষয়ে S P-কে পাঠানো টেলিগ্রাম।

জি) ট্রেনের টাইম-টেবিল-এর কয়েকটি ছেঁড়াপাতা।

এইচ) 'সাবধান! সাবধান! সাবধান! শীর্ষক প্রচার পত্র।
(মজঃফরপুর আদালতে 'প্রদর্শন' হিসাবে ব্যবহৃত)

আই) মজঃফরপুরের ধর্মশালা থেকে দীনেশচন্দ্র রায় ছদ্মনামে লেখা প্রফুল্ল চাকীর চিঠি।

জে) জনৈক অজ্ঞাত কবির স্বহস্তলিখিত দেশাত্মবোধক গান।

কে) মৃত প্রফুল্ল চাকীর ছবি (সম্মুখভাগস্থ)

এল) মৃত প্রফুল্ল চাকীর ছবি (পার্শ্বভাগস্থ)

এম) প্রফুল্ল চাকীর দেহতল্লাশিতে প্রাপ্ত রেলটিকিট (গন্তব্য : মোকামা থেকে হাওড়া)

এন) অকুস্থলের মানচিত্র।

কাচের বাক্সে নথিপত্রগুলি সাজিয়ে রাখায় বাইরে থেকে নথির প্রথম পাতাটি ছাড়া মামলার সাক্ষ্য-সাবুদসহ অন্যান্য ভিতরের কাগজপত্র কিছুই দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ক্ষুদিরামের মামলার মূল নথিটি কাচের বাক্স থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। নথির সব অংশই ছিল জজ সাহেবের নিজের হাতে লেখা। ইংরেজ সাহেবের সব হস্তলিপি আমার পক্ষেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে বোঝা গিয়েছিল মামলার বিষয়বস্তু ও সাক্ষ্য-সাবুদ।

১৯০৮ সালে বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে দেওয়া ফাঁসির আদেশটি নিজের হাতে ধরতে পেরে রোমাঞ্চ বোধ করা স্বাভাবিক ছিল।

ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশটি দেখার সৌভাগ্য হবে কোনদিন ভাবতেও পারিনি। বোধ হয় ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশটি দিয়েছিলেন মজঃফরপুরের দায়রা বিচারক ই. এইচ. বার্থহোর্ড। 'বোধহয়' বলার কারণ ইংরেজ সাহেবের নিজের নাম এত প্যাঁচানো হস্তাক্ষরে লেখা, এতদিন বাদে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছিল না।

ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার মূল নথিটির রায়ের পাতার আদেশের অংশটি বাইরে থেকেই কাচের বাক্সটির মধ্যে দেখা যাচ্ছিল।

১৯০৮ সালের ১৩ জুন মজঃফরপুরের দায়রা বিচারক স্বহস্তে লিখেছিলেন —

SENTENCE

Convicted and sentence of the Case that Khudiram Bose, be hanged by the neck until his death.

অর্থাৎ ক্ষুদিরাম বোসকে দোষী সাব্যস্ত করায় তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার গলায় থাকবে ফাঁসির দড়ি।

কাচের বাক্সটির উপরে একটি ফলক লাগিয়ে তাতে বড় বড় করে বাংলায় লেখা রয়েছে —

"কিংস্‌ফোর্ড হত্যা প্রয়াস"

'মামলায় অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ'।

মামলার নথিটির প্রথম পাতায় লেখা আছে,

In the Court of Learned Sessions Judge, Mozaffarpur.

The King Emperor

vs.

Khudiram Bose.

অর্থাৎ মাননীয় দায়রা বিচারকের আদালত, মজঃফরপুর।

রাজ সম্রাট

বনাম

ক্ষুদিরাম বোস।

ক্ষুদিরামের আপিল মামলার নথিটিও ছিল সেই কাচের বাক্সে। আপিল মামলার মূল নথিটির উপর ইংরেজিতে লেখা আছে : — Appeal was preferred in the Court of judicature at Fort William against the order of death sentence of Khudiram Bose.

'অর্থাৎ ক্ষুদিরামের মৃত্যুদণ্ডের (ফাসি) বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল জুডিকেচার অফ্ ফোর্ট উইলিয়ামে।' তখন হাইকোর্টের নাম ছিল 'জুডিকেচার অফ্ ফোর্ট উইলিয়াম'। তখন দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হত এই 'জুডিকেচার অফ ফোর্ট উইলিয়ামে'। ক্ষুদিরামের আপিলের শুনানি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১৩ জুলাই।

শ্রীঅরবিন্দর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল — সি -৪১১। ১৯০৬ সালে এই স্বদেশী পত্রিকাটির জন্ম। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার শীর্ষে লেখা থাকত ঃ—

Swadeshi paper of India	Bandemataram a daily organ of Indian Nationalism.	Our policy India for Indians.
(ভারতের স্বদেশী পত্রিকা)	('বন্দেমাতরম্' ভারতের জাতীয়তাবাদী দৈনিক মুখপত্র)	(আমাদের বক্তব্য ভারতবর্ষ ভাবতবাসীব)

এই স্বদেশী ইংরেজি দৈনিকটিতে প্রকাশিত হত মাতৃভূমির জন্য মুক্তি আন্দোলনের খবর, প্রবন্ধ, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কথা, বিপ্লবীদের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী প্রভৃতি।

শ্রীঅরবিন্দর 'বন্দেমাতরম্' ছিল বিপ্লবী যুবকদের কাছে সঞ্জীবনী সুধা। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধাদি বিপ্লবী যুবকদের দেশের স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করে তুলত। ১৮ বছরের যুবক বিপ্লবী ক্ষুদিরামের কাছেও 'বন্দেমাতরম্' দৈনিকটি ছিল বিপ্লবী কর্মধারার প্রেরণা।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার জনক শ্রীঅরবিন্দকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ কিংস্ফোর্ডের আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় তোলাকে বিপ্লবী ১৮ বছরের যুবকটি মেনে নিতে পারেনি। মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারের প্রতি ক্ষুদিরামসহ অন্যান্য বিপ্লবীদের মনে জন্মেছিল প্রচণ্ড ঘৃণা।

দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ক্ষুদিরামের বিপ্লবী-মন চাইছিল মিঃ কিংস্ফোর্ডের উপর বদলা নিতে। সশস্ত্র বিপ্লবী নেতাদের ইচ্ছায় সেই সুযোগ এল তাঁর কাছে।

ক্ষুদিরাম, আর প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুর পাঠানো হল কিংসফোর্ড নিধনে।

চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ থাকা অবস্থায় একাধিক বিপ্লবীমনা মনীষীকে মিঃ কিংসফোর্ড শাস্তি দিয়েছিলেন অন্যায়ভাবে। বিপ্লবী নেতা ও বিপ্লবী যুবকদের প্রতি তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন বিপ্লবীদের রাজদ্রোহিতার অভিযোগে দণ্ডিত করে অচিরেই ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশী অন্দোলন চিরতরে বন্ধ করে দেবেন। দণ্ডিত হওয়ার ভয়ে পরাধীন ভারতবর্ষে বিপ্লবীরা বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাবে। পরাধীন দেশের মানুষ ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে আর রাজদ্রোহিতা করতে সাহস দেখাবে না। বিদেশী প্রশাসনের ভয়ে কম্পিত থাকবে পরাধীন ভারতবাসী।

সেইটিও ছিল ১৯০৭ সাল। সাধারণ ভারতবাসী বিদেশী শাসকের অত্যাচারে জর্জরিত। এই সময় বন্দেমাতরম্ ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে একাধিক নিবন্ধ ছেপেছিল। স্বভাবতই এই সব দেশপ্রেমিক পত্র-পত্রিকার কর্ণধারদের পড়তে হয়েছিল তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের অগ্নিরোষে। একাধিক সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল রাজদ্রোহের অভিযোগে।

১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের সহোদর)। তাঁর সম্পাদনায় যুগান্তর পত্রিকায় একটি উত্তেজক নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। উত্তেজক নিবন্ধটি 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সালের ১৬ জুন। এই নিবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। অভিযোগটি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারার। তাঁকেও গ্রেপ্তার করে কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারের নামে হয়েছিল প্রহসন।

সরকারপক্ষ থেকে কিছু মোসাহেব সাক্ষীদের দিয়ে সাক্ষ্যের মাধ্যমে দিয়ে রাজদ্রোহের অভিযোগটি প্রমাণ করানো হল। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে এক বছর

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশটি দেওয়া হয়েছিল ১৯০৭ সালের ২৪শে জুলাই।

কিংস্‌ফোর্ড সাহেব শুধুমাত্র শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তকেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে থেমে থাকলেন না। তিনি কলকাতার সাধনা প্রেসটিকেও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন। কারণ ১৬ জুনের যুগান্তর ছাপা হয়েছিল এই সাধনা প্রেস থেকে। সেই সময় সাধনা প্রেসের মালিক ছিলেন শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর প্রেসের ওপর বাজেয়াপ্ত হওয়ার আদেশটি তুলে নেওয়ার জন্য সেই আদেশদানের দিনেই একটি আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ১৬ জুনের 'যুগান্তর' পত্রিকা সাধনা প্রেস থেকে ছাপা হয়নি। কিন্তু মিঃ কিংসফোর্ড কোন কথাই শুনলেন না। 'সাধনা প্রেস' বাজেয়াপ্তর আদেশ বহাল রাখলেন। পরে অবশ্য হাইকোর্টের আদেশে মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের দেওয়া প্রেস বাজেয়াপ্ত হওয়ার আদেশ খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ছিলেন বিপ্লবীদের কাছে নির্ম্মমতার প্রতীক। সশস্ত্র বিপ্লবীরা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা এই ইংরেজ সাহেবের রক্তের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী এই কাজ হাসিল করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হাসিমুখে। তাঁরা যে ছিলেন দেশের মুক্তিমন্ত্রে নিবেদিতপ্রাণ।

আলিপুর জজকোর্টের এই স্মরণীয় বিচার সংগ্রহের পুরোধা শ্রীপিয়ারীলাল দত্ত "বিচার সংগ্রহ কি ও কেন?" বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসে বাঙালির অনুপস্থিতি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন,

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ওই,
সবাই এসেছে লইয়া নিশান
কইরে বাঙালী কই।"

তারই প্রত্যুত্তরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সামনে রেখে শ্রীঅরবিন্দের বয়কটের পাঞ্চজন্যের কম্বুনিনাদ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মহাত্মা গান্ধীতে লীন হয়েছিল, তাঁরএকটি অর্কফলক সশস্ত্র বিপ্লবের মাতৃমুক্তি মন্ত্রে নিষিক্ত হয়ে সুভাষ বসুর অস্ত্র ঝঞ্ঝনায় স্বাধীনতায় লীন হয়ে গিয়েছিল। ফাঁসির মঞ্চে ও যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার মুক্তিস্নান জাতিগতভাবে বাঙালির এক অনন্যসাধারণ ঐতিহ্য, তারই কিছু পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সংগ্রহের 'অগ্নিপথ' অংশে।

এই 'অগ্নিপথ' অংশেই রয়েছে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মামলার নথিটি। পাশেই রয়েছে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর ছবিসহ নানা চিঠিপত্র। এঁরা যে অগ্নিপথের যাত্রী।

॥ ২ ॥

ক্ষুদিরাম নিজেই স্বীকার করেছিলেন, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তদানীন্তন কালের প্রকাশিত স্বদেশী পত্রিকা 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯০৭ সালে বন্দেমাতরম্ দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাই বিপ্লবী বারীন ঘোষ ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ স্নেহভাজন। ব্যারিস্টার শ্রীমনোমোহন ঘোষও ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের অপর আব এক ভাই। তিনি ছিলেন 'কর্মযোগিন' এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক। তিনি শ্রীঅরবিন্দের লেখা 'স্বদেশবাসীর প্রতি'—নামে একটি চিঠি প্রকাশ করে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এই চিঠিটি অবশ্য ক্ষুদিরামের ফাঁসির বছরখানেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কর্মযোগিন' পত্রিকা প্রকাশিত হত নারায়ণ প্রেস থেকে। শ্রীমনোমোহন ঘোষকে শ্রীঅরবিন্দর লেখা চিঠিটি পত্রিকায় ছেপে প্রকাশ করায় কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। নারায়ণ প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত কবা হয়েছিল। এই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল ১৯১০ সালের ১৮ জুন। অবশ্য এই সময় মিঃ কিংস্‌ফোর্ড কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিলেন না। এই আসনটিতে কিংস্‌ফোর্ডের জায়াগায় বসানো হয়েছিল অপর এক ইংরেজ সাহেবকে। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টে আপিল করে শ্রীমনোমোহন ঘোষ মুক্তি পেয়েছিলেন। নারায়ণ প্রেসটিও বাজেয়াপ্ত হওয়ার আদেশ থেকে রেহাই পেয়েছিল।

'যুগান্তরের' সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের দণ্ডাদেশের কথাও বলা হয়েছে। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে কিন্তু কিংস্‌ফোর্ডের নেক নজরে পড়তে হয়েছিল।

১৯০৭ সালে 'সান্ধ্য' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ছদ্মনাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সান্ধ্য' পত্রিকাটি প্রকাশিত হত ১৯৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে। আবার কোন কোন সময় ২০ নং কর্নওয়ালিস থেকে। সম্ভবত মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীহরিচরণ দাস। ক্লাসিক প্রেস এবং সরস্বতী প্রেস থেকে ছাপান হোত। কোন কোন সময় যুগান্তর পত্রিকাও ছাপানো হত সরস্বতী প্রেস থেকে।

তৎকালীন খবরের কাগজগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এদের অফিসগুলি স্থানান্তরিত করত। কারণটা ছিল ইংরেজ সরকারের রুদ্র চক্ষু এড়ানো। মাঝে মধ্যেই ইংরেজ সরকারের পুলিশ হানা দিত স্বদেশী পত্রিকার অফিসগুলিতে।

১৯০৮ সালে ৪৮ নং গ্রে স্ট্রিটের 'নবশক্তি' অফিস থেকে অরবিন্দ, বারীন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও অবিনাশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ৬৮ নং মানিকতলার সাধনা প্রেসটি মাত্র ১৪০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, পরে সাধনা প্রেসের নামকরণ করা হয় 'সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস'। ফণীন্দ্রনাথ মিত্র এই 'সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকা ছাপাতেন। তিনিও দণ্ডিত হয়েছিলেন রাজদ্রোহিতার অভিযোগে। ১৯০৮. সালে কলকাতার ৪নং রজার্স লেনে থাকতেন যুগান্তরের ম্যানেজার শ্রীতারানাথ চৌধুরী। এই বাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ রিভলভার ও কার্তুজ উদ্ধার করেছিল।

পুরনো বিপ্লবী মামলার নথিপত্র থেকে জানা যায় কলকাতার ১৫ নং গোপীনাথ দত্ত লেনে, ১২০ নং হ্যারিসন রোডে ও আরো কয়েকটি জায়গায় সশস্ত্র বিপ্লবীরা বিস্ফোরক তৈরি ও মজুত করতেন। ১৯০৮ সালে কলকাতায় অনুশীলন সমিতির মূল কেন্দ্রটি ছিল ৪৯নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। এক সময় বহুখ্যাত 'সরস্বতী' প্রেসটি ছিল ২৬নং শিবরঞ্জন দাস

লেনে। ৪৯/৩ নং কর্পোরেশন স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত হত ক্লাসিক প্রেস কর্তৃক 'নিউ ইন্ডিয়া' পেপার।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৯০৭ সালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি ছিলেন রোমান-ক্যাথলিক ও বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। তিনিও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানিয়ে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করে রাজরোষে পড়ে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে বন্দী ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি কলকাতার একটি হাসপাতালে মারা যান।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন তদানীন্তন কালের একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ও দেশপ্রেমিক। দেশের পরাধীনতা তাঁকে বিচলিত করেছিল। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতই তিনিও সশস্ত্র বিপ্লবীদের বুকে ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বালাবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

এই সব স্বদেশী সংবাদপত্র পড়ে ক্ষুদিরাম, দীনেশ চাকী, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, সুশীল সেন, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, দেবব্রত বোস, লালবিহারী সেনগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্তর মত যুবক ও কিশোররা বৃটিশ সরকারকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিলেন। মেদিনীপুরে বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল সত্যেন্দ্রনাথ বোসের নেতৃত্বে। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের দীক্ষাগুরু ছিলেন প্রকৃত অর্থে সত্যেন্দ্রনাথ বোস। সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে প্রধানত মেদিনীপুর জেলা ও কলকাতা ছিল বিপ্লবী কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্র। অবশ্য ঢাকা শহরও পিছিয়ে ছিল না। ১৯০৬-০৭ সালে ঢাকার উয়াড়িতে পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতি। এর পরেই অনুমান ১৯০৮ সালের প্রথমদিকে কলকাতায় ৪৯নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে কলকাতা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। গড়ে ওঠে যুগান্তর দল।

১৯০৮ সালের ২-রা মে কলকাতায় ৩২নং মুরারিপুকুর রোডস্থিত ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের বাগানবাড়ি-সহ আটটি স্থানে খানাতল্লাশি চালিয়েছিল বৃটিশ প্রশাসনের পুলিশ। উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। **প্রথমত,** বিপ্লবী

আখড়াগুলি থেকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা, **দ্বিতীয়ত**, বিপ্লবী আখড়া থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক পদার্থ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা, **তৃতীয়ত**, বিপ্লবের মূল কেন্দ্রগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া।

২ মে'র এই পুলিশি অভিযানের পিছনে একটি বিশেষ কারণ ছিল।

১৯০৮ সালের ১ মে ভোরের দিকে বিহারের মজঃফরপুরের ওয়ার্নিতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম। ২ মে পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে প্রফুল্ল চাকী মোকামা স্টেশনে নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ে নিজেই আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই সব কাহিনী মামলার মূল নথি থেকে যথাসময়ে তুলে ধরা হবে।

কলকাতার ইংরেজ প্রশাসনের আমলারা মজঃফরপুরে জেলা ও দায়রা জজ্ কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যার ষড়যন্ত্রের খবর নিশ্চয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন। নতুবা হঠাৎ ২ মে তারিখটিতে কলকাতার পুলিশ কর্তারা বিপ্লবী আখড়াগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কেন?

৩২নং মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িটি ছিল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমনমোহন ঘোষ ও শ্রীবিনয় ঘোষের যৌথ সম্পত্তি। এই বাগানবাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল বেশ কিছু বোমা। গ্রেপ্তার করেছিল বারীন্দ্র ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকুমার গুপ্ত, শচীন্দ্রকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মল্লিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, নরেন্দ্রনাথ বক্সি, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, নিধি ওড়িয়া, পানু ওড়িয়া, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ বোসকে।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার বিষয় বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে একাধিক বিপ্লবীর কথা। কারণ, এই সব বিপ্লবীরা প্রধানত 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নিউ-ইন্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকায় দিনের পর দিন প্রকাশিত একাধিক নিবন্ধের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

অগ্নিপথের বিপ্লবী যুবকরা শ্রদ্ধা করতেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বোসের মত

বিপ্লবী চেতনার নেতৃত্বকে। ক্ষুদিরাম বোস ও প্রফুল্ল চাকী শ্রীঅরবিন্দর আশীর্বাদ নিয়েই যাত্রা করেছিলেন বিহারের মজঃফরপুরের উদ্দেশে।

ফিরে আসা যাক্ আধ্যাত্মিক মনীষী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথায়।

১৯০৭ সালের ১৩ আগস্ট 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় —"এখন থেকে গেছি প্রেমের দায়' নামক একটি প্রবন্ধ লিখে রজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকেও তোলা হয়েছিল তদানীন্তন চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের আদালতে। বন্দী অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের অগ্নিরোষ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের ওপর। সাহেব বিচারকটির বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার দায়িত্বভার পেয়ে দেশের মুক্তি আন্দোলনে সমর্পিত জীবন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও দীনেশ চাকী গর্ববোধ করেছিলেন। ওঁরা ছিলেন মজঃফরপুর অভিযানে যাওয়ার সময় কম-বেশি ১৮/১৯ বছরের যুবক। এই বয়েস আবেগের বয়েস। এই বয়েস নিয়ে পরবর্তীকালে সুকান্ত লিখেছিলেন, 'আঠারো বছর বয়স' নামে একটি কবিতা।

'এ বয়স যেন ভীরু কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়েস যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

আবারও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কথা থেকে সরে এসেছি। শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—"এখন থেকে গেছি প্রেমের দায়" শীর্ষক নিবন্ধটির জন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের হাতে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, —

"I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the Newspaper– 'Sandhya' and I say that I am the writer of the article "Ekhan Theke Gechi Premer Dai" which appeared in the Sandhya of the 13th August 1907, being one of the articles forming the subject matter of the prosecution. But I do not want to take any

part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national developement."

B. Upadhyay

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই নির্ভীক বক্তব্য ফৌজদারী মামলায় একজিবিট হিসেবে দাখিল হয়েছিল।

বাংলায় শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের ভাবার্থ করলে বোধ হয় বলা যায়, "আমি 'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রকাশ, পরিচালনা, মুদ্রণ ও ভাল মন্দের সব দায়-দায়িত্ব স্বীকার করছি এবং এও স্বীকার করছি ১৯০৭ সালের ১৩ই আগস্টের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার নিবন্ধ 'এখন থেকে গেছি প্রেমের দায়' আমারই নিজের লেখা। এই নিবন্ধটিই সরকার পক্ষের মামলার মূল বিষয়। আমি মামলার এই বিষয়ে কোন বিতর্কে যেতে ইচ্ছুক নই কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমি স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছি।

আমি শুধু দেশবাসীর কাছে আমার কাজের যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রমাণ দিতে বাধ্য তারাই আমার পত্রিকার পাঠক, কারণ আমার দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানই আমার কাগজের মূল উদ্দেশ্য।

বি. উপাধ্যায়

'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নিউ ইন্ডিয়া', 'নবশক্তি', 'সোনার বাংলা'-র মত কিছু স্বদেশী পত্রপত্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে পরাধীন ভারতবর্ষের যুবশক্তির মধ্যে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে অনেকাংশে অগ্নিরোষ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এই সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, ম্যানেজাররা ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও নির্ভীক চেতনার মানুষ।

মামলার অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এইসব দেশপ্রেমিকরা বুক চিতিয়ে সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

ক্ষুদিরামের মত ১৮/১৯ বছরের অগ্নিপথের বিপ্লবী যুবকরা এই সব দেশপ্রেমিকদের নির্ভীকতার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মুক্তির আন্দোলনে।

ক্ষুদিরামের বিপ্লবী দীক্ষাগুরু সত্যেন্দ্রনাথ বোসকেও ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয়েছিল। ভয় কি! এরা তো দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেই সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, অশোক নন্দী, চারুচন্দ্র বসু, দীনেশ মজুমদার, গোপীনাথ সাহার মত বিপ্লবীরা ছিলেন ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার থেকে অনেক উর্ধ্বে। ওদের চাওয়ার মধ্যে ছিল একমাত্র দেশের স্বাধীনতা। মাতৃভূমি থেকে বৃটিশ রাজের উচ্ছেদ। বৃটিশ প্রশাসনকে বুঝিয়ে দেওয়া — ভারত ভারতবাসীর। দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য চাই লড়াই! লড়াই! লড়াই। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত পুরনো স্বদেশী পত্রিকা 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা'র দাম ছিল এক পয়সা।

১৯০৭ সালে অগ্নিপথের বিপ্লবীদের কাছে কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ছিলেন একজন সাদা চামড়ার মূর্তিমান বিভীষিকা। এই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি হওয়ার আগে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় , শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বোস, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য-সহ আরো অন্যান্য দেশপ্রেমিককে।

বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মনের বাসনা ছিল তিনি নির্মম কিংস্‌ফোর্ডকে রক্তস্নাত অবস্থায় দেখবেন। তা আর হল কই? কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে তাঁকে উঠতে হল ফাঁসির মঞ্চে আর প্রফুল্ল চাকীকে করতে হল আত্মহত্যা।

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর বিরুদ্ধে আনা মামলার কথায় আসার আগে তাঁদের শৈশব ও কৈশোর জীবনের কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

॥ ৩ ॥

ক্ষুদিরাম ছিলেন মেদিনীপুরের ছেলে। তাঁর বাবার নাম ছিল শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বসু। মায়ের নাম শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া বসু। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গর্ভে তিনটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল ক্ষুদিরামের জন্মের আগে। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর একটি পুত্রসন্তানের মা হওয়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল। তিনি কয়েকবার পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেও তারা কেউ বেঁচে থাকেনি। দেবীমন্দিরে ঢুকে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কাতর প্রার্থনা জানাতেন মনে মনে তিনি যেন একটি পুত্রসন্তানের জননী হতে পারেন। যদি তিনি গর্ভে কোন পুত্রসন্তান ধারণ করেন, তবে সেই পুত্রসন্তানটি যেন বেঁচে থাকে।

মন্দিরের দেবীপ্রতিমা বোধ হয় লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর কোলে একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তান এল ১৮৮৯ সালের ৩-ডিসেম্বর। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। তিন বোন অপরূপা, সরোজিনী ও ননীবালা মায়ের কোলে ফুটফুটে ভাইটিকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ভাইটির নাম রাখা হয়েছিল ক্ষুদিরাম।

বড়দি অপরূপা দেবী বয়সে ক্ষুদিরামের থেকে ছিলেন অনেক বড়। নবজাতক ভাইটিকে বড়দি অপরূপা দেবী কিনে নিয়েছিলেন তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে। তদানীন্তনকালে সাধারণ বাঙালি ঘরে একটা সংস্কার ছিল, যে মায়ের সন্তান বাঁচে না, তাঁর কাছ থেকে অন্য কেউ সন্তান কিনে নিলে নাকি সেই সন্তানের মৃত্যুভয় কেটে যায়। ক্ষুদ দিয়ে নবজাতকটিকে কিনে নেওয়া হয়েছিল বলেই নাকি ত্রৈলোক্যবাবু আর লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পুত্র

সন্তানটির নাম.রাখা হয়েছিল ক্ষুদিরাম। ত্রৈলোক্যবাবু পুত্র-কন্যা-পরিবার নিয়ে মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা হলেও কার্য উপলক্ষে তাঁকে থাকতে হত বাইরে। ক্ষুদিরামের শৈশবের অনেকগুলো দিন কেটেছিল মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুরে। মাত্র দুই বছরের ক্ষুদিরামকে রেখে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী বাংলা ১৩০২ সালের ২ কার্তিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যুর পর ক্ষুদিরামের পিতৃদেব দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। ক্ষুদিরামের সৎ-মার নাম ছিল সুশীলা দেবী। দ্বিতীয়বার বিয়ের পর ত্রৈলোক্যবাবু বেশিদিন বাঁচলেন না। তিনি ১৮৯৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। শৈশবেই ক্ষুদিরাম মা-বাবা হারালেন। বিমাতা স্বামী ত্রৈলোক্যবাবুর মৃত্যুর পরেই স্বামীর সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান। সেই অবস্থায় বড়দি অপরূপা দেবী ভাইটির সব ভার তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে। ছোট ক্ষুদিরামের কাছে বড়দি অপরূপা ছিলেন মায়ের মতন। একমাত্র ভাইটিকে খুব ভালোবাসতেন অপরূপা দেবী। দুরন্ত ভাইটির জন্য তাঁকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। ভাই ক্ষুদিরাম ছিল বড়দি অপরূপা দেবীর প্রাণ। অন্যান্য দিদিরাও অবশ্য ভাই ক্ষুদিরামকে ভালবাসতেন। কিন্তু ক্ষুদিরামের দায়-দায়িত্ব ছিল বড়দির ওপর।

বড়দি অপরূপার বিয়ে হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের শ্রীঅমৃতলাল রায়ের সাথে। অমৃতবাবু ছিলেন চাকরিজীবী। নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় অমৃতলাল স্ত্রী অপরূপা, শ্যালক ক্ষুদিরাম ও অবিবাহিত শ্যালিকা ননীবালাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছিলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি দাসপুরের হাটগাছিয়ায়। ভগ্নিপতি অমৃতলালের চেষ্টায় শ্যালিকা ননীবালার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ননীবালার বিয়ের খরচ ও ত্রৈলোক্যবাবুর রেখে যাওয়া ঋণ-শোধ করতে ত্রৈলোক্যবাবুর বসতবাড়িটিও বিক্রি করে দিতে হয়েছিল।

বড়দি অপরূপা দেবীর পুত্রসন্তানটিও ছিল প্রায় ক্ষুদিরামের সমবয়সী।

ক্ষুদিরামকে হাটগাছিয়ায় পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন তার পাঠশালায় পড়া হয়নি ভগ্নিপতি অমৃতলালবাবুর হাটগাছিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে।

১৯০১ সালে অমৃতলালবাবু চলে এসেছিলেন মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে। ক্ষুদিরামকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে। এই হ্যামিলটন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু ভাগ্নে ললিতমোহনও মামা ক্ষুদিরামের সাথে হ্যামিলটন স্কুলে একই শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন।

ক্ষুদিরাম ছিলেন শৈশব থেকেই বেপরোয়া ও ডানপিটে। কোন কিছুতেই যেন তাঁর কোন ভয় ভীতি ছিল না। সব কাজেই ভাগ্নে ললিতমোহন ছিলেন মামা ক্ষুদিরামের দোসর। সমবয়সী ভাগ্নেটি মামাকে খুব ভালোবাসতেন। ভাই ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে পাড়াপড়শির নালিশ শুনে অপরূপা দেবী তাঁর একমাত্র ভাইটির উপর চটে গেলে ললিতমোহন এসে মামার পক্ষ অবলম্বন করায় ক্ষুদিরাম বড়দির অগ্নিরোষ থেকে রক্ষা পেয়ে যেতেন।

হ্যামিলটন স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই মানুষের বিপদের কথা শুনলে তিনি সেই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এতটুকু ছেলে অথচ যেন ভয়শূন্য। তমলুকবাসীর কাছে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বালক ক্ষুদিরাম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে এই তমলুক শহরটি হয়ে উঠেছিল অহিংস ও সহিংস বিপ্লবীদের ঘাঁটি। তমলুককে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বোধ হয় কোনদিন ভুলতে পারবে না।

ছাত্রাবস্থায় ক্ষুদিরাম সশস্ত্র বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোর সংস্পর্শে এসেছিলেন। শ্রীহেমচন্দ্র ক্ষুদিরামকে চিনে নিতে ভুল করেননি।

১৯০৪ সালে শ্রীঅমৃতলাল রায় শ্যালক ক্ষুদিরাম-সহ পুত্র-পরিবার নিয়ে চাকরির সুবাদে চলে এসেছিলেন মেদিনীপুর শহরে। মেদিনীপুরে আসার পর ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম পড়াশোনার থেকেও ব্যায়াম চর্চা ও শরীর গঠনে বেশি মনোনিবেশ করছিলেন। প্যারালাল বারের খেলায় স্কুলে সবার সেরা ছিলেন তিনি। স্কুলশিক্ষক রামচরণবাবু, ক্ষুদিরামকে প্যারালাল বারের খেলা শেখাতেন। তদানীন্তন সময়ে ছোটলাট সাহেব এসেছিলেন

মেদিনীপুরে। তিনি ক্ষুদিরামের প্যারালাল বারের খেলা দেখে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। ব্যায়াম শিক্ষকেরও তারিফ করেছিলেন।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের তদানীন্তনকালে খুব নামডাক ছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাজনারায়ণ বসু। তিনিও ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রবক্তা। সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষক ছিলেন অগ্নিপথের বিপ্লবীদের সমর্থক। তাঁরা ভারতমাতার পরাধীনতা সহ্য করতে পারছিলেন না। দেশবাসীর উপর বিদেশী প্রশাসনের নিষ্পেষণ অত্যাচার দেখে তাঁদের মনও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এককথায় বলা যায় অগ্নিযুগে মেদিনীপুর ছিল প্রধানত সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র। সত্যেন বোসের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে যেমন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীউল্লাসকর দত্তের নেতৃত্বে কলকাতার মুরারিপুকুরে গঠিত হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতি। মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির কর্ণধার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে আর যাঁদের নাম বিশেষভাবে করা যায় তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সহোদর ভাই। মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতির সভ্যদের লাঠি খেলা ছোরা খেলা, আগ্নেয়াস্ত্র চালানো, বোমা বানানো শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

বিপ্লবীদের 'বন্দেমাতরম্' স্লোগানের ঢেউ এসে লেগেছিল কিশোর স্কুল ছাত্র ক্ষুদিরামের মনে। ক্ষুদিরামের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিপ্লবী জ্ঞানেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম চাইছিলেন দেশের কাজে নিজেকে নিবেদিত করতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিশোরটিকে চিনতে ভুল করেননি, তিনি ক্ষুদিরামকে নিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কর্ণধার সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। সত্যেন্দ্রনাথও কিশোরটিকে দেখে এক পলকেই বুঝে নিয়েছিলেন, —এই কিশোরটির

চোখে-মুখে রয়েছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বহ্নিরোষ। সত্যেন্দ্রনাথ দলে টেনে নিয়েছিলেন কিশোর ক্ষুদিরামকে।

স্কুল জীবনে স্কুল পালিয়ে ক্ষুদিরাম বিপ্লবী আখড়ায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। শিখছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর কলাকৌশল, বোমা বানানোর কায়দা-কানুন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হতেই শুরু হল দেশজুড়ে আন্দোলন। বাংলাকে দু-ভাগ করেছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জন। ইংরেজ প্রশাসনের স্বার্থেই লর্ড কার্জন এই নিন্দনীয় কাজটি করেছিলেন। শ্রীবিপিন পালের মত নেতৃত্ব অচিরেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যুবসমাজকে ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই ডাক এসে পৌঁছেছিল মেদিনীপুরেও। ইংরেজ প্রশাসন বাংলার যুবসমাজের অগ্নিরোষ বুঝতে 'বন্দেমাতরম্' স্লোগান নিষিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালির কণ্ঠরোধ করার সাধ্য কার! বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠল বাঙালি। দিকে দিকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। ঢাকায় বিপিন পালের উত্তেজক বক্তব্য শুনে পুলিন দাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ঢাকা অনুশীলন সমিতি। এই সমিতির দেশপ্রেমিক যুবকরা ফুঁসে ওঠেন ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। দিকে দিকে আওয়াজ ওঠে— 'বন্দেমাতরম্'।

১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজ প্রশাসন মেদিনীপুরের জেল-প্রাঙ্গণে একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এই কৃষিশিল্প প্রদর্শনীটির সভাপতি ছিলেন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন সাহেব। প্রশাসন সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা নিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকারীরা যেন এই প্রদর্শনীটিতে না আসতে পারে। ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল — প্রদর্শনীস্থলে 'বন্দেমাতরম্' আওয়াজ তোলা চলবে না।

ক্ষুদিরামের মতন বিপ্লবী চেতনার ১৮ বছরের যুবক ওয়েস্টন সাহেবের হুকুম শুনবেন কেন? তিনি দলবল নিয়ে একদিন ওয়েস্টন সাহেবের সামনে দিয়েই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে প্রদর্শনীক্ষেত্র পরিক্রমা করলেন। ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ে দেওয়া হল তাদের

হুকুম দেশপ্রেমিক যুবকরা তোয়াক্কা করেন না। সেদিন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া যুবকদের উপর জেলা প্রশাসন বেত চালিয়েছিল। বেত চালিয়ে কি ক্ষুদিরামের মত দেশপ্রেমিক যুবকদের দমন করা যায়?

দলনেতা সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামকে চোখ দিয়ে মেপে নিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন এই সদ্য যুবকটিকে কাজ দিয়ে ভরসা করা যায়। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কাঁথি, তমলুক ও অন্যান্য জায়গায় ক্ষুদিরামকে পাঠিয়েছিলেন। দলনেতার আদেশে শুরু হয়েছিল ক্ষুদিরামের পদযাত্রা। ব্রত ছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দর আশীর্বাদ পাওয়ায় ক্ষুদিরামের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। ১৯০৭ সালে দলের জন্য হাটগাছিয়ায় ডাক লুট করেছিলেন ক্ষুদিরাম।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করার পর ক্ষুদিরাম ভর্তি হয়েছিলেন মেদিনীপুর কলেজে। কিন্তু জেলা পুলিশের তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় ক্ষুদিরামকে চলে আসতে হয়েছিল কলেজ ত্যাগ করে কলকাতায়। দলের নির্দেশ সেইরকমই ছিল। ভগ্নীপতি অমৃতলালকেও ক্ষুদিরামের জন্য নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল।

ক্ষুদিরামের মামা শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত থাকতেন কলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রিটে। সতীশচন্দ্র অবশ্য ক্ষুদিরামের দূর সম্পর্কের মামা। তিনি ছিলেন স্কুল মাস্টার। সেই স্কুলটিও ছিল কর্পোরেশন স্ট্রিটে।

কলকাতায় আসার পর ক্ষুদিরাম বিডন স্কোয়ারে ও কলেজ স্কোয়ারে শ্রীবিপিন পাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজিসপতি কাব্যতীর্থের ভাষণ শুনেছিলেন। এইসব নেতৃত্বের ভাষণ শুনে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য মনে মনে আরো উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বিদেশী শাসকের নির্যাতনায় স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনার কথা শুনে ক্ষুদিরামের মধ্যে জমে উঠেছিল ইংরেজের উপর চরম বিদ্বেষ।

কলকাতায় ক্ষুদিরামের যোগাযোগ হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্তর মত বিপ্লবীদের সাথে।

চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যখন বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার মামলা চলছিল, সেই সময় প্রফুল্লকুমার চাকীর বয়েস ছিল মাত্র ১৯। ক্ষুদিরামও ছিলেন একই বয়সের যুবক। প্রফুল্ল চাকী ছিলেন বগুড়া জেলার ছেলে। তিনিও শৈশবেই পিতৃহীন হয়েছিলেন। প্রফুল্ল চাকীরা ছিলেন চার ভাই। তাদের দুটি বোনও ছিল। প্রফুল্ল ছিলেন ভাই-বোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ১৪ বছর বয়সে তিনি রংপুর জেলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুলে পড়ার সময় ছাত্রাবস্থায়ই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই ছোট ছেলেটি যেন দেশের ডাক শুনেছিলেন। তিনিও দেশের কাজে নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন। কোন একসময় অগ্নিপথের নেতা বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংস্পর্শে এসে 'যুগান্তর' দলে যোগ দিয়েছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দাদা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও ছিলেন 'যুগান্তর' দলের তাত্ত্বিক নেতা।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের সাথে ছিল ভগিনী নিবেদিতার যোগাযোগ। সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন আইরিশ মহিলা। সন্ন্যাসিনী হলেও তাঁর রক্তে ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। বারীন ঘোষ বুঝেছিলেন প্রফুল্ল চাকী অগ্নিপথের নির্ভীক যাত্রী।

প্রফুল্ল চাকীর বিপ্লবী দীক্ষাগুরু শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বাংলার ছোটলাট ছিলেন ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার। তিনি ছিলেন হিংস্রতার প্রতিমূর্তি। এই অত্যাচারী সাহেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই হত্যা পরিকল্পনার নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো ও প্রফুল্ল চাকী।

রংপুরে ধুবড়ি থেকে ট্রেনে আসার খবর ছিল প্রফুল্ল চাকীদের কাছে। ট্রেন লাইনে ব্যাটারি লাগানো বোমা পাতা হয়েছিল ছোটলাট সাহেবের জীবন শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিফল হল সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, ছোটলাট ব্যাম্‌ফিল্ড হঠাৎ মত বদলে রংপুর না এসে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। প্রফুল্ল চাকী ছোটলাট ব্যাম্‌ফিল্ডের উপর বদলা না নিতে পেরে খানিকটা নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। অগ্নিপথের যাত্রীদের নিরাশ হতে নেই।

এরপর প্রফুল্ল চাকীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাংলার অন্যতম ছোটলাট অ্যানড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে লর্ড কার্জনের আসল পরামর্শদাতা ছিলেন এই অ্যানড্রু ফ্রেজার। বঙ্গভঙ্গের পর মেদিনীপুর জেলাকেও বিভক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ফ্রেজার সাহেব। স্বভাবতই বিপ্লবীদের টারগেট (নিশানা) ছিলেন এই ফ্রেজার। তাঁকে মারার জন্য নারায়ণগড় রেল লাইনে দু-দুবার ডিনামাইট বসানো হয়েছিল প্রফুল্ল চাকীর পরিকল্পনামাফিক। কিন্তু এই ইংরেজপুঙ্গবের ভাগ্য ছিল ভাল। দুবারই তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।

বিপ্লবী নেতৃত্ব একটা কথা কিন্তু ভালভাবে বুঝে গিয়েছিলেন—প্রফুল্ল চাকী দুঃসাহসিক কাজের উপযুক্ত যুবক।

সবদিক বিচার-বিবেচনা করে বিপ্লবী নেতৃত্ব কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে। এই দুজন সশস্ত্র বিপ্লবীকে মজঃফরপুর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও তখনও পর্যন্ত ক্ষুদিরামের সাথে প্রফুল্লর আলাপ-পরিচয়ই হয়নি। একে অপরকে চিনতেন না। এদের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল মজঃফরপুরের উদ্দেশ্যে ট্রেনে ওঠার পর। তখনই তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়েছিল একই উদ্দেশ্যে তাঁরা দু-জন মজঃফরপুরে চলেছেন।

॥ ৪ ॥

এবার আসা যাক ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে আনা হত্যা অভিযোগের মূল মামলার নথিতে। নথিটি ১৯০৮ সালের। সাক্ষ্য-সাবুদ, রায় সমস্তই মজঃফরপুর জেলার দায়রা ইংরেজ জজসাহেবের স্বহস্তে লেখা। ১৯০৮ সালের বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মামলার মূল নথিটি দেখার সৌভাগ্য হবে সেই কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আলিপুরের জজকোর্টের স্মরণীয় বিচার সংগ্রহের দৌলতে এই অমূল্য নথিটি দেখা ও পড়ার সুযোগ পাওয়ায় ক্ষুদিরামের মামলার বিস্তারিত বিবরণ পরিবেশন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। মামলাটির সব ঘটনা আলোচনা করলে বোঝা যাবে আজও ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাই অজানা থেকে গিয়েছে।

মূল মামলার নথি অনুযায়ী ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে আনা হত্যা মামলাটির আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক।

মজঃফরপুরের দায়রা জজ্ ই. এইচ. বার্থউড সাহেবের কাছে বিচার হয়েছিল ১৯০৮ সালে বিপ্লবী ১৯ বছরের যুবক ক্ষুদিরামের।

১৯০৮ সালের ৩০-শে এপ্রিল রাত ৮-৩০ মিনিট। মজঃফরপুরের জেলা জজ্ ডি. এইচ. কিংস্ফোর্ড এই সময় সাধারণত ঘোড়ায় টানা গাড়িতে ক্লাব থেকে নিজের সরকারি বাংলোয় ফিরতেন। বেশিদিনই সাহেব জেলা জজটির সঙ্গে থাকতেন মিসেস্ কিংস্ফোর্ড। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী মিঃ ডি. এইচ. কিংস্ফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৮ সালের ২৫-শে বা ২৬-শে এপ্রিল মজঃফরপুরে এসে একটি ধর্মশালায়

উঠেছিলেন। ওদের দুজনের কাছেই ছিল রিভলভার। প্রফুল্ল চাকী ভাল বোমা বাঁধতে পারতেন। কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার জন্য প্রফুল্ল বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বেশ কয়েকটি বোমা বানিয়েছিলেন মজঃফরপুরের ধর্মশালায় বসে। সকলের অলক্ষে তিনি বোমা বাঁধার কাজটি করেছিলেন। অনেকের মতে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে এসেছিলেন কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে ১৯০৮ সালের ১০ এপ্রিল। এই দুই সশস্ত্র বিপ্লবী বেশ কয়েকদিন কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের গতিবিধি লক্ষ্য করে ৩০ এপ্রিলের সন্ধ্যাটি অপারেশনের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের ভাগ্য ছিল সহায়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল মজঃফরপুরের জজ্ কোর্টের পূর্বদিকের গেটের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে পকেটে রিভলভার আর হাতে বোমা নিয়ে। ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়িটি আসছিল ক্লাবের দিক্ থেকে কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বাংলোর দিকে। ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়িটি ছিল অবিকল কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ির মত দেখতে। ক্ষুদিরাম নিশ্চিত ছিলেন কিংসফোর্ড গাড়িটিতে রয়েছেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস একই রকম ফিটন গাড়ি হলেও আরোহী ছিলেন মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি এই দুই মহিলা। মিঃ কিংসফোর্ড ফিরছিলেন ক্লাব থেকে একই ধরনের ফিটনে খানিকটা তফাতে। জায়গাটা ছিল আলো-আঁধারী।

মিঃ ডি. এইচ. কিংস্‌ফোর্ড ঘোড়ায় টানা ফিটনটিতে রয়েছেন মনে করে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে গোটা দুই-তিন বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন ক্ষুদিরাম। কিংস্‌ফোর্ডের ফিটন গাড়িটিকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করার ভুলে ক্ষুদিরামের বোমার আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে হল মিসেস কেনেডি ও মিস্ কেনেডিকে। স্বয়ং কিংস্‌ফোর্ডের ফিটনটি খানিকটা পিছনে থাকায় তাঁরও কর্ণগোচর হয়েছিল বোমার আওয়াজ।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী অপারেশন করার আগে পায়ের জুতো খুলে রেখেছিলেন সামনের এক গাছতলায়। দুই বিপ্লবীর পরনে ছিল ধুতি শার্ট ও শার্টের উপর কোট। সম্ভবত গায়ের চাদরও ছিল তাদের কাছে।

ক্ষুদিরাম বোমা মারার পর বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বোমায় ভ্রমবশত দুই ইংরেজ রমণীর মৃত্যু ঘটে গিয়েছে। আসল পাখি বেঁচে গেল। কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি বোমা নিক্ষেপের সময় ঘটনাস্থলে এসে না পৌঁছনর দরুন তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল এই ঘটনার পর আর ঘটনাস্থলে সময় নষ্ট না করে দৌড়ে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেলেন। পায়ের জুতো পড়ে থাকল ঘটনাস্থলে। কিছুদূর এসে দুজনে ঠিক করলেন একই সাথে এবং একই দিকে তাঁদের দু-জনের যাওয়া ঠিক হবে না। ক্ষুদিরাম ছুটলেন ওয়ার্নি স্টেশনে।

ইতিমধ্যে মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের ফিটন গাড়িটি এসে পৌঁছল ঘটনাস্থলে। তিনি ও তাঁর গাড়ির সহিস ও পেয়াদারা দেখলেন মিসেস্ ও মিস্ কেনেডির বোমায় আহত দেহদুটি। খবর ছড়িয়ে পড়ায় মজঃফরপুরের পুলিশ সুপার-সহ অনেকেই এসে হাজির হলেন মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের বাংলোর পূর্বদিকের গেটের কাছে ঘটনাস্থলে। মিসেস্ কেনেডির দেহে তখনও প্রাণ ছিল। কিন্তু মিস্ কেনেডি বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল ঘটনাস্থলেই। মিসেস্ কেনেডিকে পাঠানো হল হাসপাতালে। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। তিনি মারা গিয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ২ মে।

মিঃ কিংস্‌ফোর্ড, পুলিশ সুপার মিঃ আর্মস্ট্রং সবাই বুঝতে পেরেছিলেন মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই বোমা ছোড়া হয়েছিল।

হত্যাকারীরা ভ্রমবশত ভুল গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করায় জেলা জজ বাহাদুর সৌভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে গেলেন। মাশুল দিতে হল কেনেডি পরিবারের দুই মহিলাকে।

মিঃ কিংস্‌ফোর্ড জানতেন তাঁর উপর বিপ্লবীদের ক্ষোভের কারণ।

ঘটনাস্থলেই চাউর হয়ে গিয়েছিল দু-জন অল্পবয়সের যুবককে কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের গেটের পাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে।

জোরকদমে পুলিশের তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। পুলিশ সুপারের কাছে গুপ্ত খবর পৌঁছে গিয়েছিল—দু-জন বাঙালি যুবক কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মশালায় বেশ কয়েকদিন আগে এসে আস্তানা গেড়েছিল। হত্যাকারীদের হদিস্ দেওয়ার জন্য ৫০০০্ টাকা ইনাম ঘোষিত হল পুলিশ সুপারের আদেশে।

জানা গেল নির্দিষ্ট ধর্মশালাটির চৌকিদার ছিল খুমন কাহার। কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় বা চৌকিদারটির খোঁজ পাওয়া গেল না।

পুলিশ সুপার আর্মস্ট্রং সাহেবও ঘটনার দিন কিংসফোর্ড সাহেবের সাথে সেদিন সন্ধ্যায় একই ক্লাবে ছিলেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ আগে ক্লাব থেকে বেবিয়ে বাড়িতে এসে ডিনার খেতে বসেছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর কাছে ঘটনার খবর পৌঁছেছিল। তিনি ছুটে চ'লে এসেছিলেন। পুলিশ সুপার আর্মস্ট্রং কিংসফোর্ডের বাংলোর কাছেই থাকতেন। তিনিও বোমার আওয়াজ বাড়িতে বসে শুনেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বিশেষ কোন পরব উদযাপিত হচ্ছে বাজি ফাটিয়ে। এই বোমার আওয়াজ যে মৃত্যুশেলের আওয়াজ তা তাঁর কল্পনায়ও ছিল না।

১৯০৮ সালের ১ মে ঘটনার পরের দিন ওয়ার্নিতে ধরা পড়লেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু।

১৯০৮ সালের ২ মে মোকামা স্টেশনে দুজন পুলিশ প্রফুল্ল চাকীকে জাপটে ধরেছিল। প্রফুল্ল বুঝতে পেরেছিল এদের হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। অথচ তিনি কিছুতেই পুলিশের হাতে ধরা দেবেন না। তখন অনুমান সকাল ১০-৩০ মিনিট। নিজের রিভলবারের গুলিতে তিনি আত্মহত্যা করলেন। তাঁর কাছে থাকা অপর পকেটের রিভলবারটি ধস্তাধস্তিতে মোকামা স্টেশনের মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। জীবন্ত অবস্থায় প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করা গেল না। কিন্তু প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহটার ওপরও মোকামা স্টেশনে পুলিশ তাণ্ডব চালিয়েছিল।

আলিপুরে 'স্মরণীয় বিচার সংগ্রহে' ক্ষুদিরামের মামলার মূল নথি ও কিছু কাগজপত্র রাখা হয়েছে একটি কাচের বাক্সে আর প্রফুল্ল চাকী সংক্রান্ত কাগজপত্র রাখা হয়েছে অপর একটি কাচের বাক্সে। মোকামা রেল স্টেশনে আত্মহত্যা করার পর বিভিন্ন দিক্ থেকে প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহের ছবি নেওয়া হয়েছিল। সেই ছবিগুলি ক্ষুদিরামের বিচারের সময় আদালতে পেশ করা হয়েছিল।

প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে ছদ্মনাম নিয়ে ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'দীনেশচন্দ্র রায়'। মজঃফরপুর থেকে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর বিপ্লবী দীক্ষাগুরু বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে ছদ্মনামে। চিঠিটির প্রাপক বারীন্দ্রকুমার ঘোষেরও ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছিল। এই মূল চিঠিটি মামলায় একজিবিট হওয়ায়—দেখার সুযোগ হয়েছিল। চিঠিটি যেমনভাবে দেখেছি ঠিক তেমনি ভাবে তুলে ধরছি। এই চিঠিটি থেকে প্রফুল্ল চাকীর হাতের লেখার আকৃতি-প্রকৃতি জানা যায়। চিঠিটির তলায় লেখা ছিল দীনেশচন্দ্র রায়।

প্রিয় সুকু দাদা,

আমরা এইখানে নিরাপদে আসিয়াছি। আসিবার সময় দুর্গাদাসের পকেট হইতে সব টাকাগুলি হারাইয়া গিয়াছে। আমার নিকট নোট ছিল তাহাতেই চালাইতেছি। সত্বর টাকা পাঠাইবেন। এখানকার অনেক দেখিলাম। বেশ মন্দ নহে। আজও বর দেখি নাই। তবে বাড়িটা একরকম দেখা হইয়াছে। বরের বাড়ি সব মন্দ নহে। যেমন হয় পরে জানাইব। আপনি নিচের নামে টাকা পাঠাইবেন। আপনি যে টাকা পাঠাইবেন তাহাতে আমাদের এখানকার কোন ঠিকানা দিবেন না।

ইতি

দীনেশচন্দ্র রায়।

পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষকেই 'সুকুদা' বলা হয়েছে। ক্ষুদিরামের ছদ্মনাম সম্ভবত দেওয়া হয়েছিল 'দুর্গাদাস'। প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে সর্বত্রই নিজের নাম দীনেশচন্দ্র রায় নামে চালিয়ে ছিলেন।

প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেও তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করবে কে?

তাই শনাক্ত করার জন্য পুলিশ ক্ষুদিরামকে নিয়ে এসেছিল মোকামা স্টেশনে। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহ শনাক্ত করে দিয়েছিলেন।

প্রফুল্ল চাকীর চিঠিতে লেখা 'বর' বোধ হয় স্বয়ং কিংসফোর্ড সাহেব। চিঠিতে কোন দিন-তারিখ ছিল না। 'বরের বাড়ি' মানে জেলা জজ কিংস্‌ফোর্ডের বাংলো।

ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর ফেলে যাওয়া জুতোজোড়াও শনাক্ত করে দিয়েছিলেন।

ক্ষুদিরামকে ওয়ার্নি থেকে গ্রেপ্তার করার পর ১ মে তারিখেই মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান সাহেবের কাছে হাজির করানো হয়েছিল। নির্ভীক ক্ষুদিরাম উডম্যানের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিলেন—তিনি ৩০ এপ্রিল কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়িটিকে লক্ষ্য করে রাত ৮-৩০ মিনিটের সময় বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত বেঁচে গেলেন কিংস্‌ফোর্ড সাহেব আর দুর্ভাগ্যবশত মারা গেলেন দুই নিরীহ মহিলা।

ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে তদন্ত শুরু হল মজঃফরপুরে। ধর্মশালার ম্যানেজার কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করানো হল ১৯০৮ সালের ৬ মে আর ধর্মশালার চৌকিদার খুমান কাহারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ৪ মে।

কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মিঃ কিংস্‌ফোর্ড কাজ করেছিলেন ১৯০৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯০৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। ইংরেজ প্রশাসনের কাছে গুপ্তখবর ছিল কিংস্‌ফোর্ডকে আর বেশিদিন কলকাতায় রাখলে তাঁর জীবন-সংশয় হতে পারে। তাই তাঁকে হঠাৎ বদলি করে মজঃফরপুরের জেলা জজ করে আনা হয়েছিল। সশস্ত্র বিপ্লবী নেতৃত্বও এই বদলির খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। মিঃ কিংস্‌ফোর্ড জেলা জজ হিসাবে মজঃফরপুরে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ২৬ এপ্রিল। সুতরাং ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে ২৬ এপ্রিলের আগে নিশ্চয়ই মজঃফরপুরে পাঠানো হয়নি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর ক্ষুদিরামও বলেছিলেন তাঁরা ৩০ এপ্রিলের ঘটনার ৩/৪ দিন আগে মজঃফরপুরে এসে পৌঁছেছিলেন। উঠেছিলেন একটি ধর্মশালায়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করা। ভুলবশত মিসেস্ ও মিস্ কেনেডি খুন হয়ে গেলেন। এই দুই মহিলার মৃত্যুর জন্য তিনি অনুতপ্ত। অন্যদিকে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে না পারায় তিনি বিশেষ দুঃখিত।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ছিলেন সত্যের পূজারী। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি বাঁচতে চাননি। না হলে কি তিনি মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের কাছে স্বীকার করতেন তিনি ফিটন গাড়িটি লক্ষ্য করে বোমা মেরেছেন? বলতেন কি তাঁর নিক্ষিপ্ত বোমায় মৃত্যু ঘটেছে মিসেস্ ও মিস্ কেনেডির? ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবীরা যে ছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর কথা ভাবতেও পারতেন না তাঁরা। আইন সম্পর্কে এই ১৮/১৯ বছরের যুবকের কোন ধ্যান-ধারণাও ছিল না। ১৯০৮ সালের ২৩ মে ক্ষুদিরামকে আইন মোতাবেক স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল সীতামারির এস.ডি.ও'র কাছে। এস.ডি.ও. সাহেব ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ—

প্রশ্ন :— তুমি গত ১-লা মে তারিখে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান সাহেবের কাছে কোন এজাহার করেছিলে?

উত্তর :— হ্যাঁ।

প্রশ্ন :— (*এজাহারের অনুবাদ করে শোনানো হল*)। এই যে এজাহার তোমাকে বাবু মন্মথরঞ্জন সেন অনুবাদ করে শুনাইলেন, তাহা ঠিক?

উত্তর :— দীনেশ আমাকে কিছু শিখিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন :— তুমি নিজের ইচ্ছাক্রমে ওই এজাহার করিয়াছিলে?

উত্তর :— হ্যাঁ।

ক্ষুদিরাম মামলার অভিযোগ থেকে বাঁচতে মিথ্যে কথা বলতে পারেননি। যদি তিনি মিথ্যের আশ্রয়ই নেবেন তাহলে তিনি কি আদালতে দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বলতে পারতেন?—

"আমি ৫ অথবা ৬ দিন আগে কলকাতা থেকে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে মজঃফরপুরে এসেছিলাম। আমি স্টেশন থেকে ধর্মশালায় এসে উঠেছিলাম। আমার সাথে অপর আর একটি ছেলেও এসেছিল। তার নাম দীনেশচন্দ্র রায়। সে আমাকে বলেছিল তার বাড়ি বাঁকিপুরে। তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় হাওড়া স্টেশনে। আমরা দু-জন একই উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। আমি মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম নিজের ইচ্ছায়। আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই কাজ করতে

একাধিক খবরের কাগজের নিবন্ধ। এইসব সংবাদপত্রের মধ্যে নাম করা যায় 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'যুগান্তর' প্রভৃতির। এই সংবাদপত্রগুলি লিখত ভারতবর্ষে ইংরেজদের জুলুমের কথা। কিংস্‌ফোর্ডের আস্তানা আমি জানতাম না কিন্তু তাঁকে হত্যা করার জন্য আমি দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলাম। কারণ তিনি বহু লোককে জেলে দিয়েছেন। আমার সাথে দীনেশের অনেক কথা হলেও আমি তাকে কখনই প্রশ্ন করিনি এই কাজ করতে তাকে কে প্ররোচিত করেছিল। আমাদের দু-জনের মধ্যে প্রথম কথাবার্তা ট্রেনে আসবার সময়। কথাবার্তার মধ্যেই আমি প্রকাশ করেছিলাম আমার উদ্দেশ্য, সেও প্রকাশ করেছিল তার উদ্দেশ্য। ট্রেনে আরো যাত্রী ছিলেন কিন্তু আমরা সেইসব যাত্রীদের সাথে কথাবার্তা বলিনি। আমরা যখন মজঃফরপুরে ৪/৫ দিন ধর্মশালায় অবস্থান করছিলাম তখন কিংস্‌ফোর্ডকে কোন সুযোগে হত্যা করতে পারি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। ২/৩ দিন কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বাড়িটি দেখতে বেরিয়েছিলাম। তাঁকে সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বাইরে যেতে দেখেছিলাম। অবশ্য সকালবেলা তাঁকে কোনদিন দেখতে পাইনি। একবার তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম।

আমার ইচ্ছা ছিল রিভলভার থেকে গুলি ছুড়ে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করব। আমার কাছে দুটো রিভলভার ছিল। (*রিভলভার দুটি তিনি শনাক্ত করে দিয়েছিলেন*)।"

উপরোক্ত এই বক্তব্য ক্ষুদিরাম বসু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ১৯০৮ সালের ১-লা মে অর্থাৎ ঘটনার পরের দিন গ্রেপ্তার হওয়ার পর।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নথিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন ক্ষুদিরামের বক্তব্য আইন মোতাবেক। বক্তব্যের তলায় আইনগতভাবে লিখেছিলেন,

"I believe that the whole of the statement was voluntarily made. It is a full and complete statement made by the accused."

H.C. Woodman
District Magistrate
1-5-08

ক্ষুদিরাম বসু কিন্তু এই স্বীকারোক্তির তলায় স্বাক্ষর করেছিলেন ২ মে। কারণটা বোঝা গেল না একদিন পরে কেন তাঁকে দিয়ে স্বাক্ষর করানো হল।

লোক দেখানো চার্জশিট দেওয়া হল মামলায়। হত্যা মামলায় শুধুমাত্র স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অভিযুক্ত আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলে ইংরেজ প্রশাসনের দুর্নাম হবে বলেই বিচারের একটা প্রহসন করা হয়েছিল। তাছাড়া হত্যা মামলার বিচার হয় দায়রা আদালতে।

চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল মুজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। চার্জশিটে ক্ষুদিরাম বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অর্থাৎ হত্যার অভিযোগ। এ ছাড়াও অপর একটি অভিযোগ সন্নিবেশিত করা হয়েছিল ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগটি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/১১৪ ধারার। এই অভিযোগে বলা হয়েছিল — দীনেশচন্দ্র রায়ের প্ররোচনায় ক্ষুদিরাম হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

এই দুটি চার্জ ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লিখেছিলেন ১৯০৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি। এরপর তদানীন্তন ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কিছু সাক্ষীর সাক্ষ্য-সাবুদ নিয়ে ক্ষুদিরামের মামলাটিকে দায়রা আদালতে সোপার্দ করে দিয়েছিলেন দায়রা বিচারের জন্য। সঙ্গে তৈরি করে দিয়েছিলেন সাক্ষীর একটি তালিকা। সাক্ষীর তালিকায় ছিল : —

১) ওয়াই আর্মস্ট্রং — পুলিশ সুপার।

২) তহশিলদার খান — কনস্টেবল।

৩) ওয়াই উইলসন — জমিদারি ম্যানেজার।

৪) কুলিরাম — মিঃ কেনেডির গাড়ির কোচম্যান।

৫) ইয়াকুব আলি — কনস্টেবল।

৬) আব্দুল করিম — টাউন ক্লাবের সদস্য।

৭) ডি.এইচ কিংসফোর্ড — জেলা জজ্।

৮) জ্যোতিষচন্দ্র সেন — ম্যাজিস্ট্রেট।

৯) ফৈয়াজউদ্দিন — কনস্টেবল।

১০) কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়— হেড ক্লার্ক (কোর্ট অফ ওয়ারদি।)

১১) এইচ. সি. উডম্যান।

১২) জগদীশসারী সূরান — টাউন এস আই।

১৩) ফতে সিং — কনস্টেবল।

১৪) জি. গ্রাঞ্জার

১৫) জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

১৬) শিউপ্রসাদ — কনস্টেবল।

১৭) আর চন্দ্র — ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্।

১৮) নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— এস. আই।

১৯) চতুর্বেদী রামাধার শর্মা — এস. আই্।

২০) লারফৎ — সইস্।

২১) মহঃ লতিফুল হোসেন।

২২) বাচ্চু নারায়ণ রায়।

২৩) হরিহর নাথ।

২৪) খেমন কাহার।

২৫) যজ্ঞেশ্বর।

(এছাড়া আরো কয়েকটি নাম ছিল তালিকায়)।

দায়রা আদালতে কোন মামলা সোপার্দ করতে হলে তদানীন্তন ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য সাবুদ আলোচনা করতে হত নির্দিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে। ফৌজদারী কার্যবিধি মেনেই ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ক্ষুদিরামের মামলাটিকে মজঃফরপুরের দায়রা আদালতে পাঠিয়েছিলেন। মামলাটির শিরোনাম ছিল

এম্পারার

বনাম

ক্ষুদিরাম

মজঃফরপুরের দায়রা আদালতে ক্ষুদিরামের বিচার হয়েছিল দায়রা জজ ই. এইচ. বার্থউড সাহেবের আদালতে। তদানীন্তনকালে দায়রা মামলায় শুনানির সময় দু-জন অ্যাসেসর নিযুক্ত করা হত।

ক্ষুদিরামের মামলায় অ্যাসেসর ছিলেন, বাবু নাথুনপ্রসাদ সিং এবং বাবু তারকপ্রসাদ সিং।

মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ শুনে অ্যাসেসর দু-জনকে নিজেদের মতামত জানাতে হত দায়রা জজ সাহেবকে। সেই মতামত শোনার পর দায়রা বিচারক তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত নিতেন।

কার বিচার? কিসের বিচার? ক্ষুদিরাম বা দীনেশ চাকীকে মজঃফরপুরের কেউ চিনতেন না। ক্ষুদিরাম ঘটনার পর ১ গ্রেপ্তার হওয়ার পরই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান সাহেবের কাছে নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে সব সত্য ঘটনা স্বীকার করে নিজের নাম সহি করে দিয়েছিলেন। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবীর পক্ষে মিথ্যে বলা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

ক্ষুদিরাম তো নিজেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান সাহেবের কাছে বলেছিলেন, "আমরা মজঃফরপুর পৌঁছানোর দুদিন পর বোমা বাঁধা হয়েছিল। তৈরি করা বোমা রাখা হয়েছিল ধর্মশালার একটি লকারে আর অন্য সব জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল একটি গ্লাডস্টোন ব্যাগে। দিন দুই তিন পরে বোমাগুলি লকার থেকে বের করে রাখা হয়েছিল একটি টিনের বাক্সে।"

ক্ষুদিরাম তাঁর স্বীকারোক্তিতে আরো বলেছিলেন, "আমি ও দীনেশ ২/৩ দিন সকালের দিকে জজ সাহেবের বাড়িটি নিরীক্ষণ করার জন্য পাশের ময়দানে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। জজ সাহেবকে আমরা দূর থেকে ২/৩ বার দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাল ভাবে দেখার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাঁকে ফিটন গাড়ি চাপতে দেখেছি কিন্তু জজ সাহেবের গায় কোট ছিল কি না ঠিক বুঝতে পারিনি। আগের দিন সন্ধের পর আমি ও দীনেশ গোটা তিনেক তাজা বোমা নিয়ে ময়দানের একটি গাছের তলায় লুকিয়েছিলাম। ঘোড়া দিয়ে চালানো ফিটন গাড়িটিকে ক্লাবের দিক থেকে আসতে দেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম সেই ফিটনটিই কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের গাড়ি। তিনি নিশ্চয়ই গাড়িটির ভিতরে রয়েছেন। সেই গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়েছে। ভ্রমবশত কাজটি হয়ে গিয়েছে।"

এর পরে ক্ষুদিরাম ঘটনাটির কথা নিজেই আরো পরিষ্কার করে দিয়ে বলেছিলেন, ''আমি ধরা পড়ি কনস্টেবলের হাতে। আমি একাই বোমা ছুঁড়েছিলাম। আমি ফিটন গাড়িটিতে বোমা নিক্ষেপ করার সময় গাছতলা থেকে এগিয়ে রাস্তার পাশে দৌড়ে গিয়েছিলাম। আমি বোমা ছোঁড়ার সময় নিশ্চিত ছিলাম অন্যান্যদের সাথে জজ্ সাহেব গাড়িটিতে আছেনই। ওই গাড়ির ভিতর কারা কারা ছিলেন বাইরে থেকে দেখতে পাইনি। জায়গাটা অন্ধকার ছিল। আমার গায়ে কোট ছিল। দীনেশের পরনে ছিল ধুতি ও কুর্তা। ধুতি-কুর্তায় সুবিধা হবে না ভেবে গাছতলাতেই দীনেশ কুর্তা খুলে ফেলে পরে নিয়েছিল ভেস্ট ও চাদর। আমাদের দু-জনের পায়েই 'সু' জুতো ছিল। বোমা নিক্ষেপের আগে পায়ের জুতো খুলে গাছতলায় রেখেছিলাম সুবিধার জন্য। বোমা ছোঁড়ার সময় দীনেশ আমার পিছনে পিছনে এসেছিল কি না লক্ষ্য করিনি। তবে দীনেশের কাছে সেদিন ছিল রিভলভার। তবে বোমা ছোঁড়ার সময় দীনেশের হাতে রিভলভার ছিল কিনা বলতে পারছি না। দীনেশ তার কাছে থাকা রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়েছিল কিনা তাও আমার জানা নেই। আমি নিজে বোমায় আহত হইনি। দীনেশ আহত হয়েছিল কিনা আমার কাছে তা অজ্ঞাত। আমরা দু-জনেই প্রথমে ধর্মশালার দিকে দৌড়ে পালাচ্ছিলাম কিন্তু একটু পরেই আমরা দু-জন দু-জনের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। আমি রেল লাইনের পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সমস্তিপুর রোডে গিয়ে উঠেছিলাম। দীনেশকে ধর্মশালার দিকে মুখ করে দৌড়তে দেখেছিলাম। প্রথম অবস্থায় আমি ও দীনেশ যখন দৌড়চ্ছিলাম, সেই সময় একজন কনস্টেবল আমাদের ডেকেছিল। আমরা তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিনি। আমরা একান্তে দৌড়চ্ছিলাম।'' ক্ষুদিরাম তাঁর স্বীকারোক্তিতে আরো বলেছিলেন,

''ঘটনার দিন সন্ধের পর অনুমান সাড়ে সাতটা। আমরা যখন জজ সাহেবের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিলাম, তখন দু-জন লোক আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল — আমরা কোথায় থাকি। আমি উত্তরে বলেছিলাম — আমরা কিশোরীবাবুর কাছে আছি। কিশোরীবাবুর নাম জানার কারণ — তিনি ধর্মশালার ম্যানেজার। আমরা কিন্তু তাঁর সাথে

সাক্ষাৎ করিনি। বেশ কিছু লোকজন হাঁকাহাঁকি শুরু করেছিল — 'সাহেব আসছেন সবাই রাস্তা থেকে হটে যাও', তখন আমি বলে উঠেছিলাম আমি একটি বাচ্চা ছেলের জন্য অপেক্ষা করছি। সে এলেই চলে যাব। এরপর আমরা পূর্ব দিকে চলে আসি। জজ সাহেবের কাছারি বাড়ি ও একটি পুকুর অতিক্রম করে আমরা এসে জজ সাহেবের বাড়ির গেটের কাছাকাছি ময়দানের গাছতলায় অপেক্ষা করতে থাকি। যখন সেই লোক দু-জন আমাদের কাছে এসে 'কোথায় থাকি' জানতে চেয়েছিল তখনও আমার বাঁ-হাতে বোমা ছিল। আমি আমার হাত ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। বোমা ছিল একটি টিনের ডিবায়। বোমা ছোঁড়ার আগে টিনের ডিবাটি ফেলে দিয়েছিলাম। তারপর গাছতলায় এসেছিলাম।

বোমা বেঁধেছিল দীনেশ। বলা যায় বোমার মালিক ছিল দীনেশ। কিন্তু বোমা দিয়ে সাহেবকে জীবন শেষ করার ইচ্ছেটা আমারই বেশি ছিল। সেই জন্যই আমি দীনেশের তৈরি বোমা নিয়েছিলাম কিংস্‌ফোর্ডকে খতম করার জন্য।" ক্ষুদিরাম আরো বলেছিলেন,

"পালিয়ে যাওয়ার আগে আমি আমার একখানা ধুতি ফেলে এসেছিলাম ধর্মশালায়। দীনেশ কিছু ফেলে এসেছিল কি-না তা বলতে পারব না।

দীনেশ আমার সমবয়সী। তার মুখের চেহারা গোলাকৃতি। শরীরের গঠন আমার থেকে মজবুত। লম্বায় প্রায় আমার সমান। মাথার চুল আমার মতই কোঁকড়ানো ও কালো। দীনেশ আমাকে বলেছিল—তার এক ভাই বাঁকিপুরে রেলে কাজ করে।"

ক্ষুদিরাম তাঁর নিজের রিভলভার ও রিভলভারের গুলি স্বীকারোক্তি দেওয়ার সময় শনাক্ত করে দিয়েছিলেন। গুলিগুলি যে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাজার ও কলকাতার বৌবাজার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তাও বলে দিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। কোন কিছুই নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেপে রাখেননি।

এর পরেও দায়রা আদালতে বিচার প্রহসন ও নিয়মরক্ষা ছাড়া আর কি হতে পারে?

লোকদেখানো বিচারের আগে ক্ষুদিরাম ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রের বিপ্লবীদের ও দেশপ্রেমিকদের মোটামুটি জানা হয়েই গিয়েছিল দায়রা বিচারের রায় কি হবে!

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল মজঃফরপুরে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা প্রয়াসের ঘটনা। ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যার সংবাদ। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তির খবর।

পরাধীন ভারতবাসী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর জন্য দুঃখিত হলেও এই দুই বিপ্লবী যুবকের সাহসিকতার জন্য গর্ববোধ করেছিলেন।

অগ্নিপথের এই দুই যুবকের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছিল নির্যাতিত ভারতবাসীর সুপ্ত মনে। ইংরেজশাসিত পরাধীন ভারতবাসীর কাছে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী হয়ে উঠেছিলেন অন্ধকারে দীপশিখা।

গ্রামে-গঞ্জে গান বাঁধা শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশী পত্র-পত্রিকায় এই দুই বীর যুবককে নিয়ে লেখা হয়েছিল একাধিক নিবন্ধ।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় লেখা হয়েছিল —

> "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজামহ্যম্।।
> পরিত্রানায় সাধুনাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

॥ ৫ ॥

আলিপুর স্মরণীয় বিচার সংগ্রহশালায় ৬নং কাচের বাক্সে দেখেছি — মোকামা স্টেশন থেকে প্রফুল্ল চাকীর বিষয়ে এস. পি'কে পাঠানো মূল টেলিগ্রামটি। বাক্সটিতে আরো রয়েছে ট্রেনের টাইম টেবিল-এর কয়েকটি ছেঁড়া পাতা, সাবধান! সাবধান! শীর্ষক প্রচারপত্র, মজঃফরপুর ধর্ম্মশালা থেকে দীনেশচন্দ্র রায় ছদ্মনামে লেখা প্রফুল্ল চাকীর চিঠি, প্রফুল্ল চাকীর দেহতল্লাশিতে প্রাপ্ত রেল টিকিট (গন্তব্য : মোকামা থেকে হাওড়া)। এ ছাড়া সেই বাক্সে রয়েছে জনৈক অজ্ঞাত কবির স্বহস্তলিখিত দেশাত্মবোধক গান। সেই গানের কিছু অংশ তুলে ধরা হল কৌতূহল নিবারণের জন্য।

গান — (সাহানা-ঝাঁপতাল)।
(কলি-৫)
দেশের দশা দেখে দুঃখে
সদা মন প্রাণ জ্বলে।
ধরম করম গেল,
হাহাকার করে সকলে।।

কুলের ফুলবতী যারা,
হ'ল কুলমান হারা।
শুনি নাই আর এমন ধারা,
কোথাও এ মহীমণ্ডলে।।

পাষণ্ড আজি কু-সঙ্গে
মায়ের প্রতিমা ভাঙ্গে।
ফাক্ থেকে হাসিছে রঙ্গে
বিদেশী শ্বেতাঙ্গ দলে।।

যদি মা মোর সত্য হয়,
জেনোরে ভাই সুনিশ্চয়।
এর প্রতিশোধ দিবেন যারা,
তাঁদের অব্যর্থ কৌশলে।।

(প-লি ৬)
মায়ের দুঃখ দেখে
সুখে কেমনে আছিস্ ভাই।
মা-যে মোদের ভিখারী
এতেও কিরে লজ্জা নাই।।

মাতালক্ষ্মী স্বরূপিনী
হলেন এখন কাঙ্গালী।
ত্রিশকোটি ছেলে মায়ের
পরের দ্বারে ভিক্ষা চাই্।।

যে যন্ত্রণা, যে লাঞ্ছনা,
সইতেছে মা যে তাড়না।
তবু চৈতন্য হলো না
দেখে অবাক হলেন তাই।

গুরখা দিয়ে করে পীড়ন
সত্য বল্লে হয় নির্বাসন।
মা মন্দিরে হয়রে বন্দী
এমন কোথা শুনি নাই।।

যদি মায়ের ছেলে হও
সবে অগ্রসর হও।
জীবন সমরে ত্বরা,
সাজরে সাজ সবাই।।

(কলি-৭) (ঝাপট - খাম্বাজ)
শোন মা তোরে দুঃখের
কথা কই।
দুঃখে দুঃখে গেল জনম
তুই থাকতে মা দয়াময়ী।।

ছেলে যদি ধুলায় পড়ে,
ধুলা ঝেড়ে মা কোলে করে।।
পাপের ধুলায় মলিন মাগো
আর কতকাল এমনি রই।।

ধুলা ঝেড়ে, দয়া করে,
কোলে নে মা ব্রহ্মময়ী।।

গানের বাকি অংশের লেখা বোঝা যায়নি।

মামলায় একজিবিট হয়েছিল নিম্নে বর্ণিত কথকতাটি। একজিবিট নম্বর পড়েছিল - ১৭৩।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

— o —

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ লাঙ্গল বন্ধ ধামে,
প্রেমতলাতে আছেন সাধু দিগ্বীজন নামে।
সেই সাধু, তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র দেবে,
চিরকাল ভক্তিভরে মনে প্রাণে সেবে।

ব্রহ্মপুত্র মহাতুষ্ট সে সাধুর প্রতি
স্বপনে আদেশ তারে করেছেন সম্প্রতি।
অষ্টমী স্নানেতে যারা আসিবেক হেথা,
জানাও তাদেরে বাছা আমার এই কথা।

বললেন তারা সবে এ লাঙ্গল কন্দে
'বন্দেমাতরম' ধ্বনি মনের আনন্দে।
তারা যেন সাবধানে করে যেন পালন,
বিদেশী বর্জন আর স্বদেশী গ্রহণ।

যদি কেহ ব্রহ্মপুত্রে বিদেশী লগন,
বিদেশী কাপড় চিনি করেরে অর্পণ।
অথবা বিদেশী দ্রব্য করে ব্যবহার,
পণ্যের বদলে হবে পাপের সঞ্চার।

যে পাপে সে পাপিষ্ঠের হবে মহারোগ,
পিতা পুত্র সহ হবে নরকেতে ভোগ।
অতএব কর সবে সযত্নে পালন,
স্বদেশী গ্রহণ - আর বিদেশী বর্জন।

প্রফুল্ল চাকীর স্বহস্তে লেখা একখানি চিঠি রয়েছে ৬নং বাক্সে। চিঠিটির শীর্ষে লেখা আছে,

বন্দেমাতরম্

শিশিরদা,

আপনার জন্য মন কেমন করে। ভেদীও আপনার কথা বলিয়া থাকে। আমি ভাল আছি। আর ওখানে যাইবার ইচ্ছা নাই। আপনি ওদিকে কেমন দেখিলেন। ভাল লাগিল কি না জানাইবেন। আমাকে লিখিবেন আপনি কবে আসিবেন।

ইতি

চাকী

মজঃফরপুর শহর থেকে মাইল ২৫ তফাতে ওয়ার্নি থেকে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, একটি বড় রিভলভার ও একটি ছোট রিভলভার, একটি কোট ও একটি কুর্তা, বুলেটস্ (রিভলভারের গুলি), একটি চেন ও একটি ঘড়ি, কয়েকখণ্ড পেপার, দিয়াশলাই ও মোমবাতি, ১০ টাকার তিনখানি নোট এবং খুচরো ১ টাকা ৭ আনা ৩ পয়সা।

মৃত প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল — একজোড়া পাম্পস্, একটি পাঞ্জাবি, একটি রিভলভার, একখণ্ড কাপড়, একটি চাদর, একটি বেনিয়ান, সমস্তিপুর থেকে হাওড়ার একটি ট্রেনের টিকিট, নগদ ৮ টাকা ১০ আনা ৯ পয়সা।

ঘটনাস্থল থেকে হত্যাকারীদের ফেলে যাওয়া জিনিসের মধ্যে ছিল, একটি টিন, ক্ষুদিরামের একজোড়া (সূ) জুতো। দীনেশের একজোড়া (সূ) জুতো, একখানি চাদর।

মজঃফরপুরের ধর্মশালাটি থেকে পাওয়া গিয়েছিল, পেতলের তালা, একটি হাতব্যাগ তুলো ভর্তি, আলু, নুন, ফুল, একটি টাইম টেবিল, হলুদের গুঁড়ো, একখণ্ড কাপড়, দীনেশের তোয়ালে, ক্ষুদিরামের একটি ধুতি, দীনেশের একটি মলমল ধুতিতে বাঁধা কিছু চাল, দীনেশের একটি

লালপেড়ে ধুতি, দীনেশের একটি কম্বল, কিছু পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, দুটি হাঁড়ি, একটি খাটিয়া।

ঘটনাস্থল থেকে মিঃ কেনেডির ফিটন গাড়িটিও নেওয়া হয়েছিল পুলিশের হেফাজতে।

প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশের মৃতদেহটি শনাক্ত করার জন্য যখন ক্ষুদিরামকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহ দেখে যখন ক্ষুদিরাম শনাক্ত করে দিয়েছিলেন তখন ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল,

STATEMENT OF KHUDIRAM

The body lying here is that of Dinesh Chandra Roy. I know him by general appearance not by any special marks. This Punjabi (Ext-A) I do not recognise. I do not recognise (Ext-B) the shoe, nor the Benion (Ext-C)।

অর্থাৎ এখানে যে দেহটি পড়ে আছে সেইটি দীনেশচন্দ্র রায়ের। আমি তাঁর দেহটি দেখেই চিনতে পেরেছি। আলাদা কোন বিশেষ চিহ্ন দেখে তাঁকে চেনার প্রশ্ন নেই।

(একজিবিট — এ) দীনেশেরই পাঞ্জাবি কি না চিনতে পারছি না। (একজিবিট — বি এবং একজিবিট — সি) জুতো ও বেনিয়ানও চিনতে পারছি না।

I do not know the pistol (Ext-D). But Dinesh told me that he had a pistol. Recognised - this chaddar (Ext-E)। অর্থাৎ আমি পিস্তলটি দেখে চিনতে পারছি না। তবে দীনেশ আমাকে বলেছিল তার কাছে একটি পিস্তল আছে। চাদরটি চিনতে পারছি।

ক্ষুদিরাম ভয়শূন্য চিত্তে যা কিছু জানতেন সব কবুল করেছিলেন।

বীর বিপ্লবী ক্ষুদরামের সেই বয়েসটা উপলব্ধি করে বলতে ইচ্ছে করছে,

"আঠারো আসুক ফিরে।"

॥ ৬ ॥

ফিরে আসা যাক মূল মামলায়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মজঃফরপুরের দায়রা আদালতে সোপর্দ করে দিলেন ক্ষুদিরামকে। এবার ১৮/১৯ বছরের ছেলেটির বিচার হবে দায়রা জজ্ ই. বার্থউডের কাছে। ক্ষুদিরামের পক্ষে কোন আইনজীবী নেই। মামলার কায়দা-কানুন সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাও নেই। হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আসামীর পক্ষে কোন আইনজীবী থাকবেন না সেইটি দেখতে ভাল দেখায় না। অভিযুক্তের পক্ষে কোন আইনজীবী না থাকলে সাধারণ দেশবাসীর মনে বিক্ষোভ জন্মাতে পারে। তাই দায়রা আদালত নিজের থেকেই প্লিডার বাবু রবিদাস বোস মশাইকে ক্ষুদিরামের আইনজীবী নিযুক্ত করলেন।

দায়রা আদালতে জজ্ সাহেব মিঃ বার্থউডের সঙ্গে দু-জন অ্যাসেসর রইলেন বাবু নাথুনি প্রসাদ সিং ও বাবু তারকপ্রসাদ সিং।

দায়রা আদালতে হত্যার অভিযোগে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে প্রথমেই চার্জটি পড়ে শোনানো হল অভিযুক্ত আসামী ক্ষুদিরাম বসুকে। এরপর শুরু হল মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম বসু। সাক্ষীর ডকে সরকার পক্ষের ১নং সাক্ষী মজঃফরপুরের তদানীন্তন পুলিশ সুপার মিঃ ওয়াই আর্মস্ট্রং, সরকার পক্ষে পাবলিক প্রোসিকিউটর।

মিঃ আর্মস্ট্রং সাক্ষ্য দিতে উঠেই বলতে শুরু করলেন, —"মিঃ কিংস্‌ফোর্ড কলকাতা থেকে বদলি হয়ে মজঃফরপুরে এসেছেন ১৯০৮ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি। আমার কাছে আগে থেকেই কিছু গুপ্ত খবর এসেছিল ২১ এপ্রিল। খবরটি মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের নিরাপত্তা সংক্রান্ত।

তাই আমি কিংস্‌ফোর্ডের জীবনের নিরাপত্তার জন্য গার্ডের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি আমার লোকজনদের খবর নিতে বলেছিলাম — বাইরে থেকে মজঃফরপুরে কোন অচেনা লোকজন এসেছে কি না! তাছাড়া দু-জন প্রহরী সন্ধ্যা ৬টা থেকে কিংস্‌ফোর্ডের বাড়ির গেটে মোতায়েন করেছিলাম। তাদের উপর নির্দেশ ছিল কিংস্‌ফোর্ড ক্লাব থেকে রাতে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তারা পাহারায় থাকবে। তাছাড়া মাঝেমধ্যেই তারা তাঁর বাড়ি ও ক্লাবের মাঝের জায়গাটায় টহল দেবে। সেই নির্দেশ ঠিকমত কার্যকরী হচ্ছিল। কনস্টেবল তহশীলদার খান ও ফৈয়াজউদ্দিনকে পাহারার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল আমি বিকেলের দিকে ক্লাবে ছিলাম। আমি সন্ধে নাগাদ ক্লাব থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। অনুমান রাত ৮-৩৫ মিনিটের সময় আমি বাড়ি থেকে বোমার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিশ্চয়ই বোমা ফাটানো হচ্ছে। তবু সময়টা দেখে রেখেছিলাম কারণ আমাকে খোঁজখবর করতে হবে কেউ বিনা অনুমতিতে বোমা ফাটাচ্ছে কি না! বিনা অনুমতিতে বোমা ফাটালে আমাকেই আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এরপর আমি ডিনার খাবার জন্য টেবিলে বসেছিলাম। এই সময় মিঃ লি এসে আমাকে খবর দেন—কিছু একটা অঘটন ঘটছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লির সাথে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেই। পথে আমার সাথে দেখা হয় মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ও মিঃ উডম্যানের সাথে। তাঁরা তখন আমাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসেন। জায়গাটা ছিল মিঃ কিংসফোর্ডের বাড়ির গেটের বিপরীত দিক্। সেই জায়গাটায় দেখতে পাই বোমার টুকরো, সুতলী, রুমাল প্রভৃতি ছিটানো ছড়ানো অবস্থায়। রক্তে রুমাল ভেজা। এছাড়াও তাজা রক্ত দেখতে পাই। কনস্টেবল ফৈয়াজউদ্দিনকে ঘটনাস্থলেই দেখতে পেয়েছিলাম। ফৈয়াজউদ্দিন আমাকে বলেছিল সেও বোমার আওয়াজ শুনেছে। সে আরো বলেছিল—ময়দানের মধ্য দিয়ে সে দু-জনকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখেছে। তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করতেই সেই দুটি মূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।"

মাননীয় প্রোসিকিউটর সাক্ষী আর্মষ্ট্রং সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, — ফৈয়াজউদ্দিন আর কিছু বলেছিল?

আর্মস্ট্রং :— সে দুজন বাঙালি যুবককে সন্ধ্যা অনুমান ৭-টা নাগাদ ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।

প্রোসিকিউটর :— এছাড়া আর কিছু বলেছিল?

আর্মস্ট্রং :— ফৈয়াজ বলেছিল, বাঙালি যুবক দু-জনের পরিচয় জানতে চাইলে তারা ফৈয়াজকে বলেছিল তারা দু-জনই ছাত্র। এখানে কিশোরী বাবুর কাছে থাকছে। ফৈয়াজ তাদের স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে বলেছিল। ফৈয়াজ বলেছিল বাঙালি যুবক দুটির বয়েস অনুমান ১৯। যুবক দুটিকে দেখলে সে তাদের শনাক্ত করতে পারবে।

প্রোসিকিউটর :— তাদের গায়ে কি ধরনের পোশাক ছিল সেই সম্বন্ধে ফৈয়াজউদ্দিন কিছু বলেছিল?

আর্মস্ট্রং :— হ্যাঁ! বলেছিল। বাঙালি যুবক দুজনের মধ্যে একজনের গায়ে ছিল কোট আর অপর জনের গায়ে ছিল শার্ট।

প্রোসিকিউটর :— কিশোরবাবুর পরিচয় সম্বন্ধে ফৈয়াজকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন?

আর্মস্ট্রং :— হ্যাঁ! করেছিলাম। ফৈয়াজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম শহরে কিশোরবাবু নামে কেউ থাকে কি-না? ফৈয়াজ উত্তরে বলেছিল, কিশোরবাবু নামে এক ভদ্রলোক সরাইয়াগঞ্জ বাজারে থাকে। আমি তখন ফৈয়াজকে বলি — আমাকে কিশোরবাবুর বাসস্থানে নিয়ে চল। সরাইয়াগঞ্জ বাজারের কাছে এলে সে আমাকে কিশোর বাবুর বাড়িটি দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেইটি আসলে কিশোরবাবুর বাড়ি ছিল না। কাউকে আমি সেখানে দেখতে পাইনি।

প্রোসিকিউটর :— এরপর আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

আর্মস্ট্রং :— আমি পুলিশ সাব ইনস্‌পেকটার চতুর্বেদী রামাধার শর্মাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম মোকামা ও বাঁকিপুরের দিকের রেল স্টেশনগুলির প্রতি ভালভাবে নজর রাখতে। আমি নিজে টেলিগ্রাফ অফিসে এসে সব উচ্চ মহলকে খবর পাঠিয়েছিলাম মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা

জানিয়ে। পুলিশ কমিশনার ও পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারদের জানিয়েছিলাম এই বোমা বিস্ফোরণের সাথে দু-জন ১৯ বছর বয়সের যুবকের যুক্ত থাকার সন্দেহের কথা। আমি সেই মুহূর্তে সন্দেহভাজন যুবক দু-জনের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর দিতে পারিনি। তাদের বিষয়ে আমার কাছে সঠিক কোন প্রামাণ্য খবর ছিল না। তারপর আমি আবার ঘটনাস্থলে ফিরে এসে দেখি মিঃ উডম্যান সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি ঘটনা সম্বন্ধে উপস্থিত লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। আমি উডম্যান সাহেবের কাছে আমার নিযুক্ত দুই কনস্টেবল তহশীলদার খান এবং ফৈয়াজউদ্দিনকে উপস্থিত করলে তিনি ওদের জবানবন্দি লিখে নিয়েছিলেন। এরপর ময়দানটি তল্লাশি করি। শুনেছিলাম এই ময়দানের মধ্য দিয়েই যুবক দুটি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছে। ময়দানের গোল পোস্টের কাছেই একটি টিন পড়ে ছিল। আমি ময়দান ও ময়দান সংলগ্ন জায়গার রাফ স্কেচ ম্যাপ তৈরি করেছিলাম। টিন বলতে আমি বোঝাতে চাইছি একটি টিনের টোবাকো কৌটোকে। টিনের কৌটোটি স্মলউড সাহেব বিস্ফোরক পরীক্ষার জন্য নিয়েছিলেন। স্মলউড্ ছিলেন বোমা বিশেষজ্ঞ। এরপর স্থানীয় মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করি সঠিক ঘটনাটি জানার জন্য। এ ছাড়াও নানারকমভাবে অনুসন্ধান করি এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার। আবার ফিরে আসি ঘটনাস্থলে। এসে দেখি ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীদের ফেলে যাওয়া জুতো ও চাদর ঘটনাস্থলের কাছাকাছি একটি গাছের পিছন থেকে উডম্যান সাহেব পেয়ে গিয়েছেন। এই গাছটি ছিল কিংস্‌ফোর্ডের বাংলোর গেটের উল্টোদিকে। আমি সেই স্থানটিরও স্কেচ্ ম্যাপ তৈরি করি। আমি ফেলে যাওয়া জুতো দেখে বুঝতে পারি বোমা বিস্ফোরণকারীরা খালি পায়ে পালিয়েছে। সেই অনুমান ও সন্দেহের কথা টেলিগ্রামে সব মহলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। গুপ্তভাবে পুলিশ সাব-ইনস্‌পেকটার ও কনস্টেবলদের আদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন বিশেষভাবে মোকামা ও বাঁকিপুর রেল স্টেশনের প্রতি নজর রাখে।

প্রোসিকিউটর :— হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য আর কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

আর্মস্ট্রং :— ঘোষণা করেছিলাম হত্যাকারীদের সন্ধান দিতে পারলে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে ধর্মশালাটিতে তল্লাশি চালিয়েছিলাম। এরপর খুব ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে কেস্ ডায়েরি লিখতে বসি।

প্রোসিকিউটর :— তারপর কী হল?

আর্মস্ট্রং:— যে গাড়িটিতে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল সেই গাড়িটি সারারাত পুলিশ গার্ড দিয়ে রেখেছিল। ১ মে ভোরে গাড়িটি তল্লাশি করি। গাড়িটির মধ্যে বোমার টুকরো ও পোড়া কাপড় পেয়েছিলাম। সিভিল সার্জেন আমার হাতে বোমার একটা টুকরো দিয়ে বলেছিলেন তিনি মিস্ কেনেডির পায়ের থেকে টুকরোটি বের করেছেন। আমি নিজেই তদন্ত করেছি। আমাকে তদন্তে সাহায্য করেছেন ডেপুটি সুপার মিঃ বি. বাচ্চু নারায়ণলাল।

প্রোসিকিউটর :— এরপর কোন সংবাদ পেলেন?

আর্মস্ট্রং :— বেলা ১-টা নাগাদ ওয়ার্নি থেকে কনস্টেবল ফতে সিং ও কনস্টেবল শিউপ্রসাদ মিশিরের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়ে জানতে পারি, ওয়ার্নিতে একটি যুবক ধরা পড়েছে। খবরটি পেয়েই আমি ট্রেনযোগে ওয়ার্নিতে পৌছে যাই। সেখানে এই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো যুবকটিকে দেখতে পাই। নাম জানতে পারি যুবকটির — 'ক্ষুদিরাম'।

ক্ষুদিরামকে আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। যে দু-জন কনস্টেবল টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন আমাকে একটি কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে খুলে দেখতে বলে।

প্রোসিকিউটর :— খুলে দেখলেন?

আর্মস্ট্রং :— নিশ্চয়ই। খুলে দেখলাম পুঁটলির মধ্যে রয়েছে দুটি রিভলভার। একটির মধ্যে গুলি ভর্তি ছিল। অপরটি ছিল ফাঁকা। এছাড়া কিছু টাকা-পয়সা ও রিভলভারের ২১টি তাজা গুলি। আমি ক্ষুদিরামকে নিয়ে বিকেলের ট্রেনে মজঃফরপুরে ফিরে এসেছিলাম ১ মে।

প্রোসিকিউটর :— তারপর ক্ষুদিরামকে নিয়ে কি করলেন?

আর্মস্ট্রং :— জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরামকে নিয়ে এসেছিলাম। আদালত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হয়েছিল স্টেশন ক্লাবে। এই স্টেশন ক্লাবেই সন্ধের পর মিঃ উডম্যান ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি লিখে নিয়েছিলেন। ক্ষুদিরামকে শনাক্ত করতে গিয়েছিল ফৈয়াজ ও তহশীলদার খান। তারা দুজনেই বলেছিল এই যুবকটিকে অন্য আর একটি যুবকের সাথে ৩০ এপ্রিল বোমা ছোড়ার পর ময়দানের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছিল। আব্দুল করিম নামে একটি ছেলেও বলেছিল এই যুবক (ক্ষুদিরাম) ও অপর একটি সমবয়সী যুবককে সে সন্ধের দিকে কিংস্‌ফোর্ডের বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ আগের দিন।

প্রোসিকিউটর :— ১ মের পরে আর কোন খবর পেয়েছিলেন?

আর্মস্ট্রং :— পেয়েছিলাম। ২ মে সকাল অনুমান ৭-টা। আমার অফিসে এসেছিলেন ডেপুটি সুপার। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন বি. শিবচন্দ্র ব্যানার্জি সমস্তিপুর থেকে পাঠানো সাব-ইনসপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জির একটি টেলিগ্রাম পেয়েছেন। ডেপুটি সুপার টেলিগ্রামের উত্তরও পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেদিনই বিকেলে রেল পুলিশের কাছ থেকে দুটি টেলিগ্রাম পাই। তাতে লেখা ছিল একটি বাঙালি যুবক মোকামা রেল স্টেশনে ধরা পড়লে সে আত্মহত্যা করেছে নিজের রিভলভারের গুলিতে। আমি তখন ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দেই মৃত যুবকটির ছবি তুলে নিয়ে ও অন্যান্য তদন্ত শেষ করে যুবকটির মৃতদেহের ব্যবস্থা করে ফেলার। আমি দু-জন কনস্টেবল ও তিনজন সাক্ষীকে যুবকটির মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য মোকামায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারা ৩ মে ভোরে মোকামায় পৌঁছে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিল। ৩ মে দুপুরে সেই যুবকের মৃতদেহটি মজঃফরপুরে নিয়ে আসা হয়েছিল। যুবকটির কাছ থেকে পাওয়া একটি ব্রাউনিং পিস্তল, রেলের টিকিট ও অন্যান্য কিছু জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলি আমি আমার হেফাজতে নিয়ে নিয়েছিলাম।

প্রোসিকিউটর :— তারপর কী করা হল?

আর্মস্ট্রং :— ৩ মে আমি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষুদিরামকে ধর্মশালায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন বেলা অনুমান তিনটে। ক্ষুদিরাম নিজেই দেখিয়ে দিয়েছিল ধর্মশালার ঘরটি, যেই ঘরে সে আশ্রয় নিয়েছিল মজঃফরপুরে আসার পরে। ঘরের তালাটি ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে একটি ক্যানভাসের ব্যাগ, টাইম টেবিল ও অন্য কিছু জিনিস পেয়েছিলাম। ৪ মে সকালে আমি মেজর স্মলউডকে পরীক্ষার জন্য কিছু জিনিসপত্র তাঁর হাতে তুলে দিই। আমার নির্দেশে ইনস্‌পেক্টর জামিরলাল হোসেন গাছতলায় পাওয়া একজোড়া জুতো মৃতদেহটির পায়ে পরিয়ে দেখে জুতোজোড়া তার কি-না!

প্রোসিকিউটর :— আর কিছু আপনি করেছিলেন?

আর্মস্ট্রং :— আমার নির্দেশে ৫ মে অভিযুক্ত কিশোরীমোহন ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ ছাড়াও তদন্তকার্য আমার পরিচালনা ও নির্দেশে হয়েছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার! অভিযুক্ত আসামীর আইনজীবী প্লিডার রবিদাস বাবু আর্মস্ট্রংকে কোন প্রশ্নই করলেন না।

সাক্ষীর সাক্ষ্যর বয়ান বাংলায় অনুবাদ করে আদালতে ক্ষুদিরামকে শুনিয়েছিলেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন সাক্ষীটিকে কোন জেরা করা হল না তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। ট্রায়ালের নামে প্রহসন। ক্ষুদিরাম কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন অবিচলভাবে। কোন চিন্তার রেখা তাঁর চোখেমুখে ছিল না। পুলিশ সুপার আর্মস্ট্রংয়ের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২১ মে।

কনস্টেবল তহশীলদার খান ছিল সরকারপক্ষের ২নং সাক্ষী।

সাক্ষ্য দিতে উঠে তহশীলদার খান বলেছিল আমি জেলা জজ সাহেবকে ঘটনার ৮/১০ দিন আগে থেকে চিনেছিলাম। আমাকে ক্লাবের সামনে নজরদারির কাজে বসানো হয়েছিল। কোন যেন গোলমাল না হতে পারে সেই নির্দেশ ছিল আমার ওপর। আমার সাথে ডিউটিতে দেওয়া হয়েছিল কনস্টেবল ফৈয়াজউদ্দিনকে। সন্ধের পর আমাদের ডিউটিতে রাখা

হয়েছিল জজসাহেবের নিরাপত্তা দেখার জন্য। আমরা দুজন কনস্টেবলই রাত ৮-টা নাগাদ ঘটনার দিন ক্লাবের পশ্চিম গেটে ডিউটিতে ছিলাম। আমি ৮/৮।। টার সময় বোমার আওয়াজ শুনেছিলাম। তার আগে দু-জন অচেনা যুবককে ক্লাবের পশ্চিম গেটের দিকে যেতে দেখেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই তাবা ফিরে এসেছিল। আমার সন্দেহ হওয়ায় ফৈয়াজের সাথে কথা বলে বাবু দুটিকে জিজ্ঞাসা করি তাদেব পরিচয়। তারা উত্তরে বলে—তারা দুজনেই ছাত্র। উঠেছে কিশোরবাবুর কাছে। আমি তাদের বলি তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এটা খেলার জায়গা নয়। তারা তখন বলে—একটি ছেলের জন্য তারা অপেক্ষা করছে। যুবক দু-জনের সাথে ক্লাবের পূর্ব গেটে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। আমার তাদের প্রতি তখন কোন সন্দেহ হয়নি। জজসাহেব সাধারণত ক্লাবের পশ্চিম গেট ব্যবহার করেন বলে আমরা পশ্চিম গেটে ডিউটি দিতে চলে আসি। বাবু দুটি ছিল ১৮/১৯ বছরের বাঙালি যুবক। তারা যে বাঙালি তাদের কথাতেই তা প্রকাশ পেয়েছিল। যুবক দুটির একজনের গায়ে ছিল কোট। অপরজনের গায়ে শার্ট। তাদের হাতে কিছু তখন দেখতে পাইনি। জজ সাহেবের ক্লাব থেকে বেরনোর অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু জজ সাহেবের আগে মিঃ কেনেডির ফিটন গাড়িটিকে ক্লাবের পশ্চিম গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম। মিঃ কেনেডির ফিটন গাড়িটি ছিল জজ সাহেবের ফিটনটির মত দেখতে। জজ সাহেবের ফিটনেব চাকায় রবার লাগানো ছিল কিন্তু মিঃ কেনেডির ফিটনের চাকায় কোন রবার ছিল না। বোমার আওয়াজ শুনেই আমি মিঃ কেনেডির গাড়িটির দিকে এগিয়ে যাই। চিৎকাব ভেসে আসছিল ডাকবাংলোর দিক থেকে। মিঃ কেনেডির ফিটন গাড়িটিকে আমি রাস্তার ওপর দেখতে পেয়েছিলাম। কোচম্যান তাব বসার জায়গায় বসেছিল। ফিটনের মধ্যে ছিলেন দু-জন মহিলা। দুই মহিলাই ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। তাদের শরীরের কাপড়-জামায় আগুন জ্বলছিল। একজন সাহেব ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে এসে কোচম্যানকে বলেছিলেন—জজ সাহেবের বাড়ির দিকে ফিটনটিকে নিয়ে যেতে। আমরা ফিটন গাড়ির কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। আমি থানায় যাওযার আগে

ফৈয়াজকে আহতদের সামনে থাকতে বলেছিলাম। আমি যখন থানায় খবর দেওয়ার জন্য ছুটছিলাম সেই সময় এক পলকের জন্য দুটি যুবককে দক্ষিণদিকে দৌড়ে যেতে দেখেছিলাম। সম্ভবত তাদের পরনে ছিল ধুতি। (আদালতের কাঠগড়ায় ক্ষুদিরামকে দেখিয়ে) এই যুবকটি সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন।

প্রোসিকিউটর :— ঘটনার পরে আর কোন সময় এই অভিযুক্ত আসামীকে দেখেছিলে?

তহশীলদার :— ঘটনার পরের দিন গ্রেপ্তার হওয়া অবস্থায় এই যুবকটিকে (ক্ষুদিরামকে) দেখেছিলাম।

প্রোসিকিউটর :— কোথায় দেখেছিলে?

তহশীলদার :— ক্লাবঘরে। আমি থানায় ছিলাম সাব-ইনস্‌পেকটার বাবু আমাকে ধৃত আসামীকে শনাক্ত করার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্লাবে। আমি ক্ষুদিরামকে শনাক্ত করে দিয়েছিলাম কালেক্টর সাহেবের কাছে। ঘটনার আগে ক্ষুদিরামের গায়ে ছিল একটি সাধারণ কাপড়ের কোট। এই ধৃত যুবকটিই ঘটনার আগে আমাকে বলেছিল সে কিশোরীবাবুর কাছে আছে।

প্রোসিকিউটর :— কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অভিযুক্ত আসামীটিকে ছাড়া আর কাউকে ঘটনার পরে দেখেছ?

তহশীলদার :— বোমা ফাটানোর পর বারাউনি জংশনে অপর যুবকটির মৃতদেহটি দেখেছিলাম। ক্ষুদিরামের সাথে ঘটনার আগে তাকে দেখেছিলাম। সেই যুবকটির মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য আমাকে, ফৈয়াজউদ্দিনকে ও আব্দুল করিমকে দুজন সাব-ইনসপেকটার কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহটি শনাক্ত করে দিয়েছিলাম একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার জবানবন্দি নথিভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

ক্ষুদিরাম বা ক্ষুদিরামের পক্ষে নিযুক্ত করা প্লিডার বাবু তহশীলদারকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি। বোধ হয় তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন জেরা করে কোন ফায়দা হবে না। সাজানো বিচার সাজানো মতই শেষ হোক্।

সরকারপক্ষের ৩নং সাক্ষী ছিলেন মিঃ আর উইলসন। মিঃ উইলসন ছিলেন জমিনদারির ম্যানেজার। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, "আমি ঘটনার দিন রাত ৮-৩০টা থেকে ৯টায় ডাক বাংলোর একটি ঘরে বসেছিলাম। সেই বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাই। ঘর থেকে আওয়াজ শুনেই রাস্তায় বেরিয়ে আসি। একজন পথচারী বলেছিল কেউ একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকাব করে বলেছিলাম 'পাকড়াও'। জজ সাহেবের বাড়ির পশ্চিম গেটের সামনে থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠেছিল 'মেমসাহেবকো মার দিয়া'। আমি একটি খোলা ফিটন গাড়িকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। কোচম্যান গাড়িতে তার আসনে বসে ছিল। ফিটনের ভিতর দুজন মহিলা আহত হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়েছিল। তাদের শরীরের জামা-কাপড় আগুনে পুড়ছিল। গাড়ির পিছনের অংশটা বোমায় উড়ে গিয়েছিল। দুজন আহত মহিলাই গোঙাচ্ছিল। রাতটিতে ছিল নিবিড় অন্ধকার। কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম গাড়িটি কার? কোচম্যান উত্তরে বলেছিল মিঃ কেনেডির। খালি হাতে যতটা সম্ভব আমি মহিলা দু-জনের ড্রেসের আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলাম। আমি কোচম্যানকে দ্রুত গাড়িটিকে জজ সাহেবের বাড়িতে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমিও গাড়িটিকে অনুসরণ করেছিলাম। কিংস্‌ফোর্ডের সাথে তাঁর বাড়ির গেটে আমার দেখা হয়েছিল।

সরকারপক্ষের ৪নং সাক্ষী ছিল মিঃ কেনেডির ফিটন গাড়ির কোচম্যান।

আমি ঘটনার দিন মিঃ কেনেডির গাড়ির কোচম্যান ছিলাম। রাত ৮-টার সময় ক্লাব থেকে মিসেস ও মিস কেনেডিকে গাড়িতে তুলে তাদের বাংলোতে নিয়ে আসছিলাম। গাড়িটি ঘোড়ায় টানা। মিঃ কেনেডির বাংলো ছিল জজ সাহেবের বাড়ির কাছেই। জজ সাহেবের বাংলোর কাছাকাছি আসতেই দু-জন যুবক গাড়ি লক্ষ্য করে গোলাকৃতি বোমা ছুঁড়েছিল। সেই বোমায় গুরুতরভাবে জখম হন মেমসাহেব দুজন। গাড়ি বোমার আঘাতে থেমে গিয়েছিল। ঘোড়া এগোতে পারেনি। একজন সাহেব ডাক্‌-বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে অবস্থা দেখে আমাকে গাড়িটি জজ সাহেবের বাড়িতে

নিয়ে আসতে বলেছিলেন। ইতিমধ্যে কিংস্‌ফোর্ড সাহেব এসে পৌঁছেছিলেন ক্লাব থেকে বাড়িতে। তিনি আহত মহিলাদের গাড়ি থেকে তুলে নিজের বাংলোতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বোমা বিস্ফোরণকারীদের পরনে ধুতি ছিল।"

ক্ষুদিরাম সাক্ষীটিকে নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন — কেমন ছিল বোমার আকৃতি?

—বলের মত গোলাকার।

৫নং সাক্ষী ছিল কনস্টেবল ইয়াকুব আলি। ইয়াকুব আলি আদালতে তার সাক্ষ্যতে বলেছিল — আমি ঘটনার সময় মতিঝিল মহল্লায় ছিলাম। বোমার আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটেছিলাম। তখন দু-জন যুবককে দৌড়ে যেতে দেখেছিলাম। তারা ধর্মশালার দিকে ছুটছিল।

এই সাক্ষীকেও কোন জেরা করা হয়নি।

সরকারপক্ষের ৬নং সাক্ষী মহঃ আব্দুল করিম বলেছিল, আমি টাউন ক্লাবের একজন সদস্য। আমি ফুটবল প্লেয়ার। ২৯ এপ্রিল বিকেল বেলা ফুটবল খেলতে যাওয়ার সময় দু-জন বাঙালি যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখি ময়দানের কাছে, তাদের সাথে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। তারা বলেছিল তারা নৈহাটি থেকে এসেছে। তাদের আমি ফুটবল খেলতে অনুরোধ করি। ক্ষুদিরাম অর্থাৎ যে কাঠগড়ায় দাঁডিয়ে সে খেলতে রাজি হয়নি। অপরজন বলেছিল, আজ খেলব না। কাল খেলব। এরপব আমি ক্লাবে চলে যাওয়ার আগে তাদের পরের দিন খেলতে আসার অনুরোধ করে যাই। ঘণ্টাখানেক বাদে ক্লাব থেকে ফেরার সময়ও তাদের জজ সাহেবের বাংলোর কাছে দাঁড়ানো দেখতে পাই।

পরের দিন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর টাউন ক্লাবের সেক্রেটারিকে আগের দিনের দেখা বাঙালি দুই যুবকেব কথা বলেছিলাম। ১ মে শুনেছিলাম ৩০ এপ্রিলের বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি গ্রেপ্তার হওয়া লোকটিকে দেখতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। ক্ষুদিরামকে (যিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে) দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। ২৯ এপ্রিল এই যুবকটিকেই আর একটি যুবকের সাথে

ময়দানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম। বারাউনিতে ২ মে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি অপর যুবকটির মৃতদেহ দেখে চিনতে পেরেছিলাম। ক্ষুদিরামের সাথে তাকেও ২৯ এপ্রিল ময়দানে দেখেছিলাম। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মৃতদেহটি সেদিনই শনাক্ত করে দিয়েছিলাম।

আব্দুল করিমকে দিয়ে এইভাবে দুই বীর বাঙালি যুবককে শনাক্ত করানো হয়েছিল।

আব্দুল করিমকেও আসামীপক্ষ থেকে কোন জেরা করা হয়নি।

ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবী বোধ হয় আব্দুল করিমের সাক্ষ্য শুনে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছিলেন বিচারের প্রহসন দেখে।

সরকার পক্ষের ৭নং সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে ডকে উঠেছিলেন স্বয়ং সেই কিংস্‌ফোর্ড সাহেব, যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঘটনার উৎপত্তি। তিনি প্রথমেই বললেন "আমি ১৯০৪ সালের আগস্ট থেকে ১৯০৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কলকাতার চিফ্ ম্যাজিস্ট্রেট্ হিসেবে 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা মামলাগুলির বিচার করেছিলাম। পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায়।"

ইংরেজিতে সাক্ষ্যর এই অংশ লেখা হয়েছিল, "I was Chief Presidency Magistrate of Calcutta from August 1904 to March 1908. Whilst I held the appointment I tried cases under sec. 124A I.P.C. against 'Jugantar' newspaper 2 or 3 times, also against the 'Sandhya' and 'Bande Mataram' newspapers."

এছাড়াও আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার করেছি। বহু আসামীকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছি আবার বহু আসামীকে শাস্তি দিয়েছি। আমি স্বদেশী পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের বিচার করায় আমাকে সমালোচনা করে পত্র-পত্রিকায় নানারকম লেখা প্রকাশ করা হচ্ছিল। বাংলা পত্রিকা

'অমৃতবাজার' আমার বিরুদ্ধে কুৎসা ছাপাচ্ছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকা বহু রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ প্রকাশ করে যাচ্ছিল। আমাকে কেন্দ্র করে নানা ক্ষোভের কথা আমার কানে পৌঁছেছিল। বিপ্লবীদের মনে নাকি অগ্নিরোষ দানা বেঁধেছিল আমার বিরুদ্ধে। নানাদিক বিবেচনা করে কলকাতা থেকে আমাকে মজঃফরপুরে বদলি করা হয়েছে। ২৬ মার্চ আমার বদলির আদেশ হয়। আমি জানতাম না আমার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ থেকে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৩০ এপ্রিল সন্ধে থেকে রাত ৮।। টা পর্যন্ত আমি ক্লাবে ছিলাম। আমার অভ্যেস ছিল সন্ধের পর ক্লাবে সময় কাটানো। এক ঘোড়ায় টানা আমার একটি 'লারডোনলেটি ড্রাম' গাড়ি ছিল। সেই গাড়িটিতে ঘটনার রাতে মহিলা দু-জন চেপেছিলেন সেই গাড়িটিকে আমি চিনতাম। সেই গাড়িটিও আমার গাড়ির মতই দেখতে ছিল। তাই গাড়ি দুটির মধ্যে কোনটা কার তা বাইরের লোকের পক্ষে দূর থেকে দেখে বোঝা কঠিন ছিল। তাই দূর থেকে গাড়ি দেখে — কার কোনটা সেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক ছিল। গাড়ি দুটির একরকম চেহারার জন্য অনেকেই গুলিয়ে ফেলত। "That carriage is similar to mine and at night might easıly be mistaken for mine".

৩০ এপ্রিল সন্ধের পর থেকে আমার স্ত্রীও আমার সাথে ক্লাবে ছিলেন। মিসেস ও মিস্ কেনেডি তাদের 'লারডোনলেটি' গাড়িতে চেপে আমাদের আগেই ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

আমার গাড়ি ক্লাবের গেট থেকে ২০ গজ এগোতেই আমি বোমার আওয়াজ শুনতে পাই ও আগুনের হলকা দেখতে পাই। রাতটি বড় অন্ধকার ছিল। আমি আমার বাংলোর গেটের কাছে আসতেই রাস্তার উপর দেখতে পাই কিছু পোড়া জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো। আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে যাওয়ায় কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তারপরেই আমার বাংলোর পূর্ব গেট যার সামনে ডাকবাংলো রয়েছে সেদিক থেকে চেঁচামেচি শুনতে পাই। একটু এগিয়ে যেতে কানে এসেছিল কে যেন বলছে, 'বাঙালি লোক মেমসাহেব কো মার দিয়া'। মিঃ কেনেডির গাড়িটি রয়েছে আমার বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে। মিঃ উইলসন ছাড়াও ৫/৬ জন লোক

সেখানে জমায়েত ছিল। একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবলও ছিল। আমি গিয়ে গাড়িটির ভিতরে উঁকি দিতেই দেখতে পেলাম গাড়ির মধ্যে ভীষণভাবে আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন মিসেস ও মিস কেনেডি। মনে হল তাদের জ্ঞান নেই। মিঃ কেনেডির গাড়িটিরও খুব ক্ষতি হয়েছিল। আমি মিসেস কেনেডির জখম হওয়া দেহটি গাড়ির থেকে তুলে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাই। মিঃ উইলসন গাড়ির থেকে তুলে এনেছিলেন মিস্ কেনেডির দেহটিকে। আমি গাড়ি নিয়ে সিভিল সার্জেনের বাড়ি যাই তাকে নিয়ে আসার জন্য কিন্তু তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তখন গেলাম মিঃ উডম্যানের বাংলোয়। তাঁকে বাড়িতে পেয়ে তাঁকে তুলে নিয়েছিলাম গাড়িতে। এরপর যাচ্ছিলাম মিঃ আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ির দিকে। তাঁর সাথে রাস্তাতেই দেখা হয়ে গলে। তাঁকেও গাড়িতে তুলে নিলাম। আবার গেলাম সিভিল সার্জেনের বাড়িতে। এবার তাঁকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। তাঁকে আমার বাংলোতে নিয়ে এলাম। বাংলোয় ফিরে দেখলাম মিস্ কেনেডি মারা গিয়েছেন কিন্তু মিসেস্ কেনেডির দেহে তখনও প্রাণ ছিল। ৩০ এপ্রিল রাতেই মজঃফরপুর ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

নাটের গুরু কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে পর্যন্ত আসামীর পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

ক্ষুদিরাম কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এই নির্মম সাহেবটির সাক্ষ্য শুনছিলেন বিকারহীন চিত্তে।

অদৃষ্ট! যার বাঁচার কথা ছিল না তিনি বেঁচে গেলেন। কিংস্‌ফোর্ডের জীবনের মাশুল দিতে হল কেনেডি পরিবারকে।

কিংস্‌ফোর্ডের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২২ মে। কত দ্রুততার সাথে মামলার বিচার যে হচ্ছিল—তারিখ দেখলেই তা মালুম হয়।

সরকারপক্ষের ৮নং সাক্ষী ছিলেন পাটনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন। তিনি বললেন, "পাটনার পুলিশ সুপার ২ মে রাতে এসে আমাকে তাঁর সাথে যেতে বললেন। পাটনার পুলিশ সুপার ছিলেন মিঃ সোয়াইন। তিনি বলেছিলেন, একটি লোক মোকামা রেল স্টেশনে

আত্মহত্যা করেছে। লোকটির মৃতদেহ নিয়ে যেতে হবে মোকামা থেকে মজঃফরপুরে। প্রয়োজনে মৃতদেহটির শনাক্তকরণের সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে উপস্থিত থাকতে হবে। বারাউনি জংশনে তিনজন সাক্ষীর সাথে দেখা সাক্ষাত হয়েছিল। আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল মৃতদেহের সামনে। মৃতদেহটি ছিল প্ল্যাটফর্মের উপরে। সেখানে আমার সামনেই মৃতদেহটির ছবি তোলা হয়। সুরতহাল তৈরি করার সময় এক এক করে সাক্ষীদের ডাকা হয়। প্ল্যাটফর্মেই সাক্ষীদের 'ওথ' দেওয়া হয়। প্রথম সাক্ষীটি ছিল আব্দুল করিম। মৃতদেহটি দেখে সে প্রথমে শনাক্ত করতে পারছিল না। সে বলেছিল, মৃতদেহের চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছে তাই সে চিনতে পারছে না। অন্য দুজন সাক্ষী যখন মৃতদেহটি শনাক্ত করে দিয়েছিল তখন সেই আব্দুল করিমই বলেছিল সে মৃতদেহটি চিনতে পেরেছে। একেই সে ২৯ এপ্রিল অন্য এক যুবকের সাথে মজঃফরপুরের কোর্ট ময়দানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল।

পরের সাক্ষী তহশীলদার খান ও ফৈয়াজ খান কিন্তু অনায়াসে মৃতদেহটি শনাক্ত করেছিল। তারা দু-জনেই বলেছিল ৩০ এপ্রিল সন্ধে সাতটার সময় এই ছেলেটিকে তারা মজঃফরপুরের জেলা জজের বাড়ির কাছাকাছি দেখেছিল। এই মৃত ছেলেটির গায়ে ছিল সাদা শার্ট।"

এই সাক্ষীকেও কোন জেরা করা হয়নি।

অনেকেই হয়ত জানেন না — ক্ষুদিরামের সাথে কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। কিশোরীমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি মজঃফরপুরের ধর্মশালায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে থাকতে দিয়েছিলেন সব জেনেশুনে। সরকারপক্ষের বক্তব্য ছিল কিশোরীবাবু আগে থেকেই জানতেন—ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ছিলেন অগ্নিপথের যাত্রী। তাঁদের অভিপ্রায়ও কিশোরীবাবুর জানাই ছিল।

কনস্টেবল ফৈয়াজউদ্দিন সাক্ষ্য দিয়েছিল সরকারপক্ষের ৯নং সাক্ষী হিসেবে। ফৈয়াজউদ্দিন তার সাক্ষ্যতে বলেছিল, "আমি জেলা জজ সাহেবকে চিনতাম। আমি ঘটনার সাক্ষী। ঘটনার ৮/৯ দিন আগে থেকেই জজসাহেবের নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। আমার সহকর্মী

তহশীলদার খানও একই কাজে নিযুক্ত ছিল। আমাদের কাজ ছিল ক্লাব থেকে জজ সাহেবের বাড়ির গেট পর্যন্ত পেট্রলিং করা। জজ সাহেব ক্লাব থেকে বেরিয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকে গেলে আমাদের ডিউটি শেষ হত। ঘটনার দিন একই কাজে আমরা দু-জন কনস্টেবল নিয়োজিত ছিলাম। ঘটনার দিন সন্ধে সাতটার সময় দু-জন বাঙালি যুবককে জজসাহেবের বাংলোর পূর্ব গেটের সামনের রাস্তায় দেখেছিলাম। এই যুবকদের কিছুক্ষণের মধ্যে দেখেছিলাম ক্লাবের পশ্চিম গেটের সামনে। তারা সেখান থেকে আবার ফিরে আসতেই তাদের পরিচয় জানতে চাই। তারা বলে তারা স্কুলের ছাত্র। তাদের তখন প্রশ্ন করেছিলাম তারা কি জন্যে এই স্থানে এসেছে। উত্তরে তারা বলেছিল—একজন লোকের জন্য তারা অপেক্ষা করছে। তখন আবার তাদের প্রশ্ন করি তারা কোথায় থাকে? তারা বলে কিশোরীবাবুর কাছে। তাদের তখন বলা হয়— এখান থেকে চলে যাও। তারা তখন সেখান থেকে পূর্বদিকে চলে যায়। যুবক দুটির বয়েস ১৮ থেকে ২০'র মধ্যে ছিল। একজনের পরনে ছিল ধুতি ও কোট আর অপর জনের পরনে ছিল ধুতি ও শার্ট। পায়ে ছিল ইংরেজি জুতো। তাদের মাথায় টুপি ছিল না। খালি মাথা। তাদের কথাবার্তা শুনে ও চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তারা বাঙালি যুবক। আসামী ক্ষুদিরাম অন্যজনের থেকে মাথায় খাটো। ক্ষুদিরামকে আদালতে দেখতে পাচ্ছি। অপরজনকে বারাউনি জংশনে মৃত অবস্থায় দেখেছি। যতদূর মনে পড়ছে দারোগাবাবু ঘটনার একদিন বাদে আমাদের বারাউনি নিয়ে গিয়েছিল। আব্দুল করিমকেও সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। একজন বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট্ আমাদের বক্তব্য লিখে নিয়েছিলেন। পাটনার পুলিশ সুপার সাহেবও সেই সময় সেখানে ছিলেন। আমি মৃতদেহটি শনাক্ত করে দিয়েছিলাম। আমি বোমার আওয়াজ শুনে দৌড়ে ঘটনাস্থলে এসেছিলাম। বোমার ধোঁয়ায় ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবুও বোমা নিক্ষেপকারীদের অনুসন্ধানে ময়দানের গোল পোস্ট পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিলাম। কাউকে পাইনি। আমি গাড়ির সহিসকে আহত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি এই অবস্থায় তহশীলদারকে চিৎকার করে ডেকেছিলাম। তহশীলদার বলেছিল সে আহত মহিলাদের

গার্ড দিচ্ছে কাজেই তাদের ছেড়ে আসতে পারছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমার কাছে এসে আমাকে বলে আহত মহিলাদের গার্ড দিতে। সে থানায় খবর দিতে চলে যায়। পরের দিন আমি ক্ষুদিরামকে ক্লাবে দেখতে পাই। সেখানে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একজন কনস্টেবল। আমি ক্ষুদিরামকে ক্লাবে দেখেই তাকে শনাক্ত করেছিলাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। আমাকে ডেকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল থানা থেকে। আমি ক্লাবে পৌঁছানোর আগে ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের খবর জানতাম না।"

সাক্ষী ফৈয়াজকেও আসামী পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

সরকারপক্ষের ১০ নং সাক্ষী ছিলেন কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন কোর্ট অফ ওয়ার্ড-এর বড়বাবু। তিনি তার সাক্ষ্যতে নতুন কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি ক্ষুদিরামকে প্রথম দেখেছেন ১০ এপ্রিল মজঃফরপুরের সেকেন্দ্রাবাদ ময়দানে। সময়টা ছিল সকালবেলা। তারিখটি মনে রাখার কারণ—দিনটি ছিল 'হিন্দু হলিডে'। প্রাতঃভ্রমণের সময় ময়দানে দেখেছিলাম ছেলেটিকে। সে একাই ছিল। ক্ষুদিরাম একটি গাছতলায় বসে ছিল। মজঃফরপুরে ছেলেটিকে নতুন দেখার দরুন তাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কে? ছেলেটি বলে সে একজন ভ্রমণ-পিপাসু। তার যাওয়ার কথা বেনারসে। কিন্তু তার টাকা-পয়সা চুরি হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যে সে মজঃফরপুরে এসেছে। ছেলেটি আরো বলে সে একজন স্কুল ছাত্র। তার কাছে জেনেছিলাম মজঃফরপুরে তার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। তাই উঠেছে ধর্মশালায়। আমি তাকে বলেছিলাম-তুমি বোধ হয় ঘর পালানো ছেলে। সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল-এখানে আপনি যাদেরই নতুন দেখেন তাদেরই মনে করেন ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে? আমি কোন উত্তর না দিয়ে চলে এসেছিলাম। ঘটনার পর সেই ছেলেটির উপর সন্দেহের কথা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মনোরঞ্জন সেনের কাছে বলেছিলাম। তিনি আমাকে থানায় জানানোর পরামর্শ দেন। আমি তাই করেছিলাম।

ক্ষুদিরাম সাক্ষীটিকে নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন।

—কবে আপনি আমাকে প্রথম মজঃফরপুরে দেখেছিলেন?

—১০ এপ্রিল।

এরপরেই সাক্ষ্য দিতে উঠেছিলেন মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান সাহেব। তিনি বলেছিলেন "ঘটনাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমগ্র তদন্তকার্যের ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল। আমাকে জজ সাহেব কিংস্‌ফোর্ড নিজে এসে খবর দিয়ে তাঁর গাড়িতে করে সিভিল সার্জেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিংস্‌ফোর্ডের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম তিনি আর্মস্ট্রংকে নিয়ে সিভিল সার্জেনের বাড়ি গিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে আসার জন্য কিন্তু তিনি তাঁকে বাড়িতে পাননি। আবার তাই আমরা সিভিল সার্জেনের বাড়িতে যাই। তাঁকে বাড়িতে পেয়ে তাঁকে নিয়ে চলে এসেছিলাম কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বাংলোতে।

ঘটনাস্থল দেখলাম। আহত মহিলাদের অবস্থা দেখলাম। মিস্ কেনেডির দেহে প্রাণ না থাকলেও মিসেস্ কেনেডি তখনও কোনক্রমে বেঁচেছিলেন। দেখলাম মিঃ কেনেডির এক ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়িটির অবস্থা। ঘটনার সব কথা শুনলাম।

কনস্টেবল ফৈয়াজ খান ও তহ্‌শীদারের জবানবন্দি নথিভুক্ত করে নিলাম। প্রাথমিক সব ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। ক্ষতিগ্রস্ত মিঃ কেনেডির গাড়িটি ছিল জজ সাহেবের বাংলার চৌহদ্দির মধ্যে। গাড়িটির পিছনের অংশ বোমায় উড়ে গিয়েছিল। গাড়ির কোচম্যানও আহত হয়েছিল। তার বয়ানও লিখে নিয়েছিলাম। ওপরওয়ালাদের টেলিগ্রাম করে ঘটনার বিষয় জানিয়ে ছিলাম। মিঃ উইলসনের বক্তব্যও লিখে নিয়েছিলাম ৩১ এপ্রিল রাতেই।

অনুসন্ধানের জন্য ডাকবাংলোর কাছে গিয়ে দেখতে পাই পোড়া কাগজপত্র. বোমার টুকরো প্রভৃতি। এরই মধ্যে একজন কনস্টেবল এসে খবর দিল একপাটি জুতো পাওয়া গিয়েছে। আমি লণ্ঠন নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম। জজ সাহেবের বাংলোর পূর্ব গেটের প্রায় কাছেই পাওয়া গিয়েছিল একটি চাদর। খুঁজেপেতে গাছের তলায় পাওয়া গিয়েছিল আর একজোড়া জুতো। আর একখানা জুতোও গাছের তলায় পাওয়া গিয়েছিল। আগের পাওয়া জুতোর অপর পাটি। ফেলে যাওয়া চাদরটিতে একটি বড়

ফুটো ছিল। আরো কয়েকজনের জবানবন্দি নথিভুক্ত করে ঢুকেছিলাম কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বাংলোর ভিতরে। সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত ছিলাম। এরপর বাড়িতে সেই রাতে ফিরে এসেছিলাম। আমি কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বাড়িতে বসেই দুষ্কৃতীদের ধরে দেওয়ার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছিলাম। সেইমত জনসাধারণের মধ্যে পুরস্কারের ঘোষণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপারকে ইনামের কথা প্রচার করার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এই পুরস্কার ঘোষণার প্রচারপত্র। এস.পি কে একটি মানচিত্র তৈরি করে সমগ্র এলাকাটিকে চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিই।

১ মে আবার মিঃ কেনেডির গাড়ির কোচম্যান, কনস্টেবল ফৈয়াজ খান ও তহশীলদারের বয়ান রেকর্ড করি। কমিশনার সাহেবের সাথেও দেখা করেছিলাম। ১ মে সন্ধের পর খবর পাই ওয়ার্নি স্টেশনে একটি সন্দেহভাজন যুবককে ধরা হয়েছে। আমি, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য অফিসাররা খবর পেয়ে ওয়ার্নি স্টেশনে পৌঁছেছিলাম। ধৃত ক্ষুদিরামকে সেখানে প্রথম দেখতে পাই। ক্ষুদিরামকে নিয়ে আদালতে পৌঁছেছিলাম। কোর্টরুম বন্ধ থাকায় এবং ভীষণ অন্ধকার থাকায় ক্ষুদিরামকে নিয়ে এসেছিলাম ক্লাবে। পুলিশ সুপার আমার কাছে এসে বললেন, ক্ষুদিরাম স্ব-ইচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিতে চাইছে। আমি সেই কথা শুনেই ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করে নিয়েছিলাম ক্লাবে বসেই। ক্লাবে টেবিল চেয়ার ও লাইট ছিল তাই সেখানে বসে স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করতে সুবিধা হয়েছিল। ক্ষুদিরামকে ক্লাবে আনা হয়েছিল একটি ফিটন গাড়িতে। আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম, ক্ষুদিরাম স্ব-ইচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। তাকে কেউ স্বীকারোক্তি করতে চাপ দেয়নি। ক্ষুদিরাম বাংলায় সব কথা বলেছিল। ওখানে তখন বাঙালি কেউ না থাকায় আমি ইংরেজিতে তার স্বীকারোক্তি লিখতে বাধ্য হই। ক্ষুদিরাম ইংরেজি বুঝতে পারত। তাকে তার স্বীকারোক্তি পড়ে শোনালে ঠিকমত লেখা হয়েছে বলে সে স্বীকার করে এবং নিজের নাম স্বাক্ষর করে বাংলাতে। আমি সেই রেকর্ড করা স্বীকারোক্তিটি দায়রা

আদালতে দাখিল করলাম। আমার স্বাক্ষর ও সার্টিফিকেট রয়েছে স্বীকারোক্তির তলার অংশে।”

প্রোসিকিউটর .— ক্ষুদিরামকে শনাক্ত করেছিল কে?

উডম্যান :— ফৈয়াজ খান ও তহশীলদার। অবশ্য আব্দুল করিমও ছিল। ফৈয়াজ ও তহশীলদার ক্ষুদিরামকে শনাক্ত করে দেওয়ার পরে আমি আবার কনস্টেবল দুটির জবানবন্দি লিখে নেই। ওয়ার্নি স্টেশনে ক্ষুদিরামকে ধরেছিল কনস্টেবল শিউপ্রসাদ মিশির এবং ফতে সিং। তাদের জবানবন্দিও আমি লিখে নিয়েছিলাম। মোকামা স্টেশনে সেই যুবকটি ২ মে আত্মহত্যা করেছিল তার মৃতদেহ মজঃফরপুরে নিয়ে আসা হয়েছিল ৩ মে। আমি মোকামা স্টেশনেই তার মৃতদেহটি দেখেছিলাম। ক্ষুদিরামকে সেই মৃতদেহটি দেখানো হয়। অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম মৃতদেহটি দেখে বলে, এই মৃতদেহ দীনেশচন্দ্র রায়ের। ক্ষুদিরাম যে বক্তব্য রেখেছিল তাও আমি লিখে নিয়েছিলাম আলাদা কাগজে।

প্রোসিকিউটর :— এরপর আপনি কী কবলেন?

উডম্যান :— কুলিরামকে নিয়ে ধর্মশালার দিকে গিয়েছিলাম। কুলিরাম ধর্মশালার একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল,—যুবক দুটি এই ঘরেই উঠেছিল। ঘরটির দরজায় তালা ঝুলছিল। আমার নির্দেশে তালা ভাঙা হয়। কিছু খাবার দাবার ও একটি ক্যানভাসের ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল ঘরটিতে।

প্রোসিকিউটর :— আর কী করেছিলেন?

উডম্যান :— মিঃ রাউল্যান্ডকে গাছের তলায় পাওয়া জুতো ক্ষুদিরামের পায়ে পরিয়ে পরীক্ষা করে নিতে বলেছিলাম।

প্রোসিকিউটর : — পরীক্ষা করা হয়েছিল?

উডম্যান :— হ্যাঁ। হয়েছিল? একজোড়া জুতো ক্ষুদিরামের পায়ে ফিট্ করেছিল।

প্রোসিকিউটর :— আর কিছু করেছিলেন?

উডম্যান :— জানতে পেরেছিলাম কলকাতা থেকে মানি অর্ডার যোগে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে মজঃফরপুরে টাকা পাঠানো হয়েছিল। কলকাতার পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট থেকে এর সত্যতা যাচাই করে নিয়েছিলাম।

প্রোসিকিউটর :— আপনার আর কিছু বলার আছে?

উডম্যান :— বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তাঁর লিখিত মতামত পেয়েছিলাম। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে তদন্ত করেছিলাম। উডম্যান সাহেবের সাক্ষ্যও দায়রা আদালতে নেওয়া হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২২ মে। আসামীদের পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে।

১২নং সাক্ষী ছিলেন টাউন সাব-ইনস্‌পেকটার জগদীশহরি সুরান।

জগদীশ সুরান কনস্টেবল তহশীলদারের কথামত তাঁর বক্তব্য লিখে সেইটিকে মামলার প্রথম এত্তেলা হিসাবে নথিভুক্ত করেছিলেন। ক্ষুদিরামের মামলার প্রথম এত্তেলাকারী ছিল কনস্টেবল তহশীলদার। টাউন থানার খাতায় লেখা ছিল—৩০ এপ্রিল সন্ধেয় তহশীলদার ও ফৈয়াজকে ডিউটি দেওয়া হয়েছিল জজ সাহেবের বাংলো ও ক্লাবের কাছে দেখভাল করার জন্য।

১৩নং সাক্ষী ফতে সিং ও ১৬নং সাক্ষী শিউপ্রসাদ মিশির ওয়ার্ন স্টেশন থেকে ১ মে ক্ষুদিরামকে ধরে ফেলেছিল। মজঃফরপুর থেকে এরা দুজন সহ্ আরো কনস্টেবল ওয়ার্নি স্টেশনে এসে নেমেছিল ১ মে ভোর তিনটের সময়। তারা বাঙালি যুবক দুটির আকৃতি ও জামাকাপড় সম্বন্ধে জেনে এসেছিল। প্রথমে তারা দুটি ট্রেনের কামরায় অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু কাউকেই ট্রেনের কামরায় পাওয়া গেল না। এবার তারা প্লাটফর্মেই ঘুমিয়ে নিল সকাল ৭টা পর্যন্ত। আবার অনুসন্ধান করতে নেমে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে তারা দেখতে পেল একটি বাঙালি ছেলে একটি দোকানের সামনে বসে জল পান করছে। ছেলেটিকে দেখে কনস্টেবলদের সন্দেহ হওয়ায় তারা ছেলেটিকে প্রশ্ন করেছিল—'তুমি কোথায় যাচ্ছ এবং এখানে কোথা থেকে এসেছো?' প্রথমে ছেলেটি বলেছিল সে পূর্ব দিক্ থেকে এসেছে। তারপর আবার বলেছিল সে আসছে তাজপুর থেকে। যাবে বাঁকিপুরে। 'বাঁকিপুর যেতে হলে এখানে নামলে কেন? তোমাকে'ত মজঃফরপুর থেকে ট্রেন পাল্টাতে হবে। ছেলেটি বলেছিল— সে খুব তৃষ্ণার্থ তাই এখানে জল পান করতে নেমেছে!'

ছেলেটি আরো বলেছিল—তার উপোস চলছে। উপোস ভাঙতেই সে এই স্টেশনে নেমেছে। এর পরেই ছেলেটি বসার জায়গা থেকে উঠে দৌড় লাগায়। ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ মিশিরও তার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে। ছেলেটিকে তারা ধরে ফেলে। তার পকেটে পাওয়া যায় গুলিভর্তি পিস্তল। এরপর তারা ছেলেটির হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। কোমরেও দড়ি বাঁধে। কোমরে বা হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধবার আগে ছেলেটি তার কোমর থেকে একটি ছোট আকারের পিস্তল বার করেছিল। কনেস্টবলরা পিস্তলটি ছেলেটির হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ছেলেটিকে বেঁধে ফেলার পর তার দেহ তল্লাশি করা হয়।

ছেলেটির গায়ে ছিল একটি কোট। পরনে ধুতি। ছেলেটির কোটের পকেটে বেশ কয়েকটা গুলি ছিল। এ ছাড়াও তার ধুতির এককোণে বাঁধা ছিল আরো কিছু গুলি। তিনটি দশ টাকার নোট ও আরো কিছু খুচরো টাকা-পয়সা পাওয়া গিয়েছিল ছেলেটির কাছে। ছেলেটিকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছিল স্টেশনে। ওয়ার্নি থেকে ছেলেটির গ্রেপ্তারের কথা টেলিগ্রাম মারফত জানানো হয়েছিল মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারকে। সুপার সাহেব ১ তারিখ বেলা ৩টা সাড়ে তিনটার সময় পৌঁছে যান ওয়ার্নি স্টেশনে। কনেস্টেবলরা তখন ধৃত আসামী ও তার কাছে পাওয়া মালামাল পুলিশ সুপারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ সুপার ধৃত যুবকসহ সকলেই মজঃফরপুরে পৌঁছে যায় সন্ধে ৬টা নাগাদ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফতে সিং শিউপ্রসাদ জবানবন্দি দিয়েছিল ২ মে। ফতে সিং তাজা গুলি গুলোকে আদালতে রেখে বলেছিল, এই গুলিগুলো ক্ষুদিরামের পকেটে ও ধুতির খুঁটে ছিল।

ক্ষুদিরামের কোট, ধুতি, দুটি পিস্তল, গুলি, টাকা-পয়সা সবই বিচারের সময় আদালতে দাখিল করা হয়েছিল।

ক্ষুদিরাম অস্বীকার করেননি যে সেগুলি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

তাঁকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারেও তাঁর কোন প্রশ্ন ছিল না।

সরকারপক্ষের ১৫নং সাক্ষী জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তার সাক্ষ্যে

বলেছিল—তার একটি লেমোনেড ও পান বিড়ির দোকান আছে ধর্মশালায়। ডেপুটি সুপার ঘটনার ১০/১৫ দিন বাদে আমাকে কয়েকটি ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন— সেই ফটো দেখে আমি তাদের শনাক্ত করতে পারি কিনা! আমি ক্ষুদিরাম ও দীনেশের ছবি দেখে বলেছিলাম— যতদূর মনে পড়ছে আমি এই দু-জনকে ধর্মশালায় দেখেছি।

ক্ষুদিরামকে আদালতের কাঠগড়ায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ শনাক্ত করে দিয়েছিল।

শিউপ্রসাদ ১৬নং সাক্ষী হিসাবে দায়রা আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ফতে সিং যা যা বলেছিল কনেস্টবল শিউপ্রসাদও তাই তাই বলেছিল। ক্ষুদিরামকে ওয়ার্নি স্টেশনে সে ও ফতে সিং গ্রেপ্তার করেছিল। ক্ষুদিরাম যখন দৌড়ে পালাচ্ছিলেন সেই সময় তারা দুই কনেস্টেবল পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরেছিল। শিউপ্রসাদ মিশিরও ক্ষুদিরামের হেফাজাত থেকে পিস্তল ও গুলি পাওয়ার কথা দায়রা আদালতে জজ সাহেবের কাছে ফতে সিংয়ের মত একইভাবে বলেছিল।

শিউপ্রসাদ আরো বলেছিল ক্ষুদিরামের পিস্তল থেকে গুলি বার করেছিলেন ডেপুটি সুপার। শিউপ্রসাদও ধৃত যুবকটি-সহ অন্যান্যদের সাথে এসেছিল মজঃফরপুরে। তার জবানবন্দিও লিখে নিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান সাহেব।

১৭নং সাক্ষী আর চন্দ্র ছিলেন মজঃফরপুরের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তাঁকে যেতে হয়েছিল জেলে ক্ষুদিরামকে সেই সু-জুতো পরিয়ে পরীক্ষা করার জন্য। ক্ষুদিরাম বিনা প্রতিবাদে সেই জুতো পায়ে পরে দেখিয়ে দিয়েছিল সেই জুতোজোড়া তারই। সে গাছের তলায় জুতোজোড়া খুলে রেখে অপারেশন করেছিল অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল রাতে ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়িটিকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেছিল। কোনরকম দ্বিধা দেখা যায়নি ক্ষুদিরামের মধ্যে।

সরকারপক্ষের ১৯নং সাক্ষী ছিলেন সিংভূমের পুলিশ সাব-ইনস্‌পেক্টার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছুটি কাটাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে দায়রা আদালতে বলেছিলেন, "আমি ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুরে ছিলাম।

অবশ্য সিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে মজঃফরপুরে এসেছিলাম। আমি ১ মে সকালেই ঘটনার কথা জানতে পারি। শুনেছিলাম দু-জন বাঙালি যুবক ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি ১ মে সন্ধে সাড়ে ৬টায় সিংভূমের উদ্দেশে মজঃফরপুর থেকে ট্রেন ধরেছিলাম। আমার সাথে সমস্তিপুরে ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়েছিল একটি বাঙালি যুবকের। তার পরনে ছিল ধুতি আর গায়ে ছিল কুর্তা। পায়ে ছিল পাম্পসু।

জুতোজোড়া নতুন বলে মনে হয়েছিল। অনেক কথাবার্তাই হয়েছিল ছেলেটির সাথে। আমি ছেলেটির কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম তার ট্রেনের টিকিট মোকামা ঘাট পর্যন্ত। ছেলেটির সাথে কথাবার্তা বলে তার ওপর আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। সমস্তিপুর থেকে ট্রেন ছাড়ার আগে আমার মামাকে (যিনি গভর্নমেন্ট প্লিডার) বলেছিলাম ডেপুটি সুপারকে একটি টেলিগ্রাম করতে। তিনি যেন আমাকে অনুমতি প্রদান করেন সন্দেহভাজন যুবকটিকে গ্রেপ্তার করার। আমি টেলিগ্রামের উত্তর পেয়েছিলাম সকাল সাড়ে ১০টায় মোকামায় ২ মে। আমার নানারকম প্রশ্ন শুনে বাঙালি যুবকটি বিরক্ত হয়ে ট্রেনের অন্য কামরায় চলে গিয়েছিল। আমি কিন্তু তার প্রতি লক্ষ্য রাখছিলাম। মোকামায় ট্রেন থামলে সেই যুবকটিকে বলেছিলাম আমার মালপত্রের দিকে সে যেন একটু লক্ষ্য রাখে। যুবকটিকে আরো বলেছিলাম—আমার কথায় সে বিরক্ত হলে আমাকে যেন সে ক্ষমা করে দেয়। আমার একটু কাজ আছে। কাজ সেরেই আমি চলে আসব। বেশি দেরি হবে না। আমি কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম আমি যুবকটিকে গ্রেপ্তার করবই।

আমি মোকামা স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের ঘরে এসে দু-জন লোক দিতে বলেছিলাম যারা গ্রেপ্তারের সাক্ষী থাকবে। দু-জন সাক্ষী আমার সাথে এসেছিল। আমার সাথে মোকামা স্টেশনে চতুর্বেদি রামাধার শর্মার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে মজঃফরপুরের পাঠানো একটি টেলিগ্রাম দিয়েছিল।

আমি বাঙালি যুবকটির কাছে এসে বলেছিলাম—'তোমার প্রতি আমার সন্দেহ হচ্ছে কাজেই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব।' সেই কথা

শুনে যুবকটি লাফ দিয়ে বিশ্রামকক্ষের দিকে ছুটল। আমি ও চতুর্বেদিও তার দিকে ছুটলাম। চিৎকার করছিলাম। চিৎকার শুনে রেল পুলিশ দৌড়ে এসেছিল। আমাকে বলা হল—যুবকটিকে ধরতে গেলে সে নাকি রিভলভার থেকে কনেস্টবলদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। কিন্তু যুবকটিকে জাপটে ধরতেই সে নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে। এরপর আমিও মৃতদেহ মজঃফরপুরে আনবার সময় সঙ্গে ছিলাম। বারাউনিতে মৃতদেহের ছবি নেওয়া হয়েছিল।

মৃতদেহের ছবিগুলি দায়রা আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে ছবিগুলি আদালতে একজিবিট করানো হয়। দীনেশের ট্রেনের টিকিটটিও দাখিল করা হয়েছিল আদালতে।

ভারি মজার ব্যাপার—বাঙালি অফিসারটির জন্যই দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকীকে মরতে হল। ইংরেজ প্রশাসনের তল্পিবাহকের দল সর্বত্রই ছিল।

২০নং সাক্ষী চতুর্বেদি রামাধার শর্মা ছিলেন পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টার। তিনিও নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যর সাথে মিল রেখে বলেছিলেন, ৩০ এপ্রিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাকে দিয়ে একঝাঁক পুলিশ পাঠানো হয়েছিল বিভিন্ন রেল স্টেশনে। ২ মে সকালের দিকে আমি ছিলাম মোকামা স্টেশনে। আমি ১ মে রাতেই মোকামা স্টেশনে এসে কয়েকজন পুলিশকে নামিয়েছিলাম চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য। তার আগে আমি ওয়ার্নি স্টেশনে ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ মিশিরকে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম একই নির্দেশ দিয়ে।

সাব-ইনস্পেক্টার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সকাল সাড়ে ১০ টায় আমার দেখা হয়। তার কাছ থেকেই তার একটি বাঙালি যুবকের প্রতি সন্দেহের কথা জানতে পারি।

তাকে গ্রেপ্তার করার সময় সে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে।

মৃত যুবকটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল মজঃফরপুরে। তার আগে মৃতদেহের একাধিক ছবি নেওয়া হয়েছিল। ডেপুটি সুপার মৃতদেহটি নিজেদের হেফাজাতে নিয়েছিলেন।

আসামীপক্ষ থেকে রামাধারবাবুকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

২১নং সাক্ষী লুরফাত মিঃ কেনেডির গাড়ির 'সহিস' ছিল। লুরফাত তার সাক্ষ্যতে বলেছিল আমি ৩০ এপ্রিল রাত ৮।। টার সময় ক্লাব থেকে মিসেস কেনেডি ও মিস্ কেনেডিকে গাড়িতে তুলে মিঃ কেনেডির বাংলোতে ফিরছিলাম। কালীচরণ ফিটনটি চালাচ্ছিল আর আমি গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের গাড়ি যখন জজসাহেবের বাড়ির পূর্ব গেটের সামনে এসে পৌঁছায় তখন রাস্তার অপর পাশ থেকে কয়েকটা গোলাকার বলের মত জিনিস ছোঁড়া হয়েছিল আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে। যারা সেগুলি ছুঁড়েছিল আমি তাদের চিনতে পারিনি। দু-জন যুবককে দৌড়ে পালাতে দেখেছিলাম। আমি বিস্ফোরণ ঘটতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আমি জজ সাহেবের গেটের সামনেই পড়েছিলাম। আমাকে পরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি এখনও স্বাভাবিকভাবে কোন কাজকর্ম করতে পারছি না।

ইনস্‌পেক্টার লতিফুল হোসেন ছিলেন সরকারপক্ষের ২২নং সাক্ষী।

তিনি সাক্ষ্য দিতে উঠে বলেছিলেন, ''আমি ৩ মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারকে নিয়ে গিয়েছিলাম ধর্মশালায়। ক্ষুদিরামও আমাদের সাথে ছিল। ক্ষুদিরাম একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই ঘরে তারা উঠেছিল। ঘরটির দরজায় তালা ঝুলছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তালা ভাঙা হয়েছিল। ঘরে ঢুকে ঘরের মালামালের একটি তালিকা তৈরি করে মালামালগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল। ৫ তারিখ আমি ডেপুটি সুপারকে নিয়ে গিয়েছিলাম কিশোরীমোহনবাবুর বাড়ি তল্লাশি করতে। কিশোরীমোহনবাবুকে তাঁর বাড়িতেই পাওয়া গিয়েছিল। তাঁকে ডেপুটি সুপার প্রশ্ন করেছিলেন,—তিনি ক্ষুদিরাম ও দীনেশ চাকীকে চিনতেন কি না! তাদের মজঃফরপুর আগমনের উদ্দেশ্যই বা জানতেন কি না! উত্তরে কিশোরীমোহন বাবু বলেছিলেন, তিনি এদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

আমি কিশোরীমোহনকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো দেখতে পাচ্ছি। কিশোরীমোহনবাবুকে ৫ মে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ক্ষুদিরাম ও দীনেশ সম্বন্ধে কিশোরীমোহনবাবু কিছু বলতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ও হত্যা মামলার আসামী করা হয়েছিল।

ধর্মশালার চৌকিদার কেনাকে গ্রেপ্তার করে থানা লকআপে রাখা হয়েছিল।

ডেপুটি সুপার চার্জশিট দাখিল করেছিলেন কিশোরীমোহনবাবুর বিরুদ্ধে।

সরকারপক্ষের ২৩নং সাক্ষী ছিলেন ডেপুটি সুপার বাচ্চু নারায়ণলাল।

তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন আমার বাড়ি থেকে আমি ৩০ এপ্রিল রাতে বোমা ফাটার আওয়াজ শুনতে পাই। এর পর ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে চলে এসেছিলাম। আমি দুষ্কৃতীর সন্ধানে ময়দান, কাছারি, ক্লাব, রেল-স্টেশনে গিয়েছিলাম। সবদিকে কনেস্টেবল পাঠিয়েছিলাম দুষ্কৃতী ধরতে। দুষ্কৃতীদের চেহারার একটা বিবরণ দিয়েছিলাম তল্লাশিতে নিযুক্ত পুলিশদের। ১ মে সারাদিন এই মামলার তদন্তে ব্যস্ত ছিলাম। ২ মে গভরনেন্ট প্লিডারের কাছ থেকে একটি জরুরি টেলিগ্রাম পাই।

টেলিগ্রামের পিছনেই উত্তর লিখে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি কিশোরীমোহনবাবুর বাড়ি তল্লাসি করেছিলাম। দীনেশের মৃতদেহ মজঃফরপুরে নিয়ে এসেছিলাম মোকামা স্টেশন থেকে। এ ছাড়াও তদন্তের সব কাজেই কম-বেশি ছিলাম।

ডেপুটি সুপারের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২৩ মে।

সরকারপক্ষের ২৪নং সাক্ষী ছিল ধর্মশালার ক্লার্ক হরিহরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাকে ডাকা হয়েছিল কিশোরীমোহনবাবু, দীনেশ ও ক্ষুদিরামের হস্তলিপি চেনবার জন্য।

২৫নং সাক্ষী ত্যাগেশ্বর তেওয়ারী ছিল পোস্টাল পিওন।

২৭নং সাক্ষী রামধারী মিশির ছিল মেহেতা ওয়ার্ডস্ এস্টেটের পিওন। এই পিওনটি তার সাক্ষ্যতে বলেছিল দু-জন বাঙালি যুবক ধর্মশালায় উঠেছিল। কিশোরীবাবুকে এসে বাংলায় কি যেন বলেছিল, তা আমি বুঝতে পারিনি। কিশোরীবাবু যুবক দুজনের জন্য একটি ঘর খুলে দিতে বলেছিলেন। সেইমত আমি একটি ঘর তাদের থাকার জন্য খুলে দিই। আমি যুবকদের কাউকেই চিনতে পারব না। কয়েক মিনিট তাদের দেখেছিলাম মাত্র।

২৮নং সাক্ষী ধর্মশালার দপ্তরী। এই লোকটি কিশোরীবাবুর বাড়িটি পুলিশকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

২৯নং সাক্ষী ছিল একজন এক্কাচালক। ধর্মশালার সামনে তার এক্কা স্ট্যান্ড।

আদালতে দীনেশের ছবি দেখে এক্কাওয়ালা বলেছিল এই যুবককে আমি ধর্মশালায় থাকতে দেখেছি। (ক্ষুদিরামকে দেখিয়ে) এই যুবকটিকেও আমি ধর্মশালায় দেখেছিলাম।

ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তির পরে এবং পরবর্তীকালে সেই স্বীকারোক্তি অস্বীকার না করায় এতগুলি সাক্ষী এনে বিচারের প্রহসন না করলেই বা কি এমন ক্ষতি হত? দেশের বিপ্লবী নেতৃত্ব ও দেশের মানুষ ক্ষুদিরাম ও দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকীর বীরত্বে গর্বিত বোধ করেছিলেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করল দেশের স্বাধীনতার জন্য। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে কি রায় দান করা হবে তা বুঝতেও কারো অসুবিধা হয়নি।

মামলায় সাক্ষ্য-সাবুদ শেষ হতে অ্যাসেসর দু-জনের অভিমত জানতে চেয়ে জজসাহেব সেদিন এজলাশ থেকে নেমে গিয়েছিলেন।

এদিকে দিকে দিকে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ। শোনা যাচ্ছিল এখানে-সেখানে একই ধ্বনি, বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!! বন্দেমাতরম্!!!

॥ ৭ ॥

১৩ মে ,১৯০৮, মামলার রায়দানের দিন। পরাধীন ভারতবাসী মামলার পরিণাম জানলেও ১৩ মে দিনটির জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। বাংলার ক্ষুদিরাম ভারতবাসীর নয়নের মণি।

১নং অ্যাসেসর বাবু নাথুনিপ্রসাদ সিং জজ সাহেব বার্থউডকে জানিয়ে দিলেন, "I think that the prisoner has been proved to be guilty of murder."

অর্থাৎ, আমার অভিমত আসামীর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধ প্রমাণ হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে।

২নং অ্যাসেসরও তাঁর অভিমত জানালেন মাননীয় বিচারককে—"I also think that the charge of murder is proved."

অর্থাৎ আমিও মনে করি হত্যার অভিযোগ আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে। তারিখ ১৩-৬-১৯০৮।

In the Court of Learned sessions Judge, Mugffarpur.

13th June 1908

King Emperor

vs.

Khudiram Bose

JUDGEMENT

আদালতে সময়-মত এসে জজ সাহেব ই. বার্থউড এজলাশে নিজের আসন গ্রহণ করলেন। আসামীর কাঠগড়ায় নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য অর্পিতপ্রাণ ক্ষুদিরাম বসু।

জজ সাহেব ইংরেজিতে নিজের হাতে লিখে নিয়ে এসেছেন মামলার রায়। লিখিত রায়ের পাতা খুলে আসামীর উদ্দেশে তিনি প্রথমেই পড়লেন মামলার বিবরণ। এরপর বললেন তিনি সাক্ষ্য-সাবুদ বিচার বিবেচনা করে ও অ্যাসেসরদের মতামত শুনে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন অভিযুক্ত আসামী ক্ষুদিরাম বসুই মিসেস্ কেনেডি ও মিস্ কেনেডিকে হত্যা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

আমি চিন্তা-ভাবনা করে তাকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল

SENTENCE

Convicted and sentenced of that Khudiram Bose, be hanged by the neck until his death.

E. Brethwood

13th June, 1908

ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে হলে হাইকোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন। তাই বার্থউড সাহেব ক্ষুদিরামের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়ার পর মামলার নথিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হাইকোর্টে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী।

অন্যদিকে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়েছিল কোর্ট অফ্ জুডিকেচার অ্যাট্ ফোর্ট উইলিয়ামে।

আপিল দায়ের করা হয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চে। ডিভিশন বেঞ্চের মাননীয় জজ ছিলেন মিঃ ব্রেট ও মিঃ রিভেস্।

দণ্ডিত আসামী ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত আইনজীবী বাবু নরেন্দ্রকুমার বোস। সরকার পক্ষে ছিলেন ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রানসার মিঃ ওর।

একসাথেই শুনানি হয়েছিল ডেথ্ রেফারেন্স ও আপিলের।

হাইকোর্ট আপিল খারিজ করে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ অনুমোদন করে দিয়েছিলেন। হাইকোর্টের অনুমোদন পাওয়ার পর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করতে আইনত আর কোন বাধা ছিল না।

হাইকোর্টে ক্ষুদিরামের পক্ষে আপিল দায়ের করা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ৬ জুলাই। আপিলের নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১৩ জুলাই।

ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয় ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট মজঃফরপুর জেলে।

গণ্ডক নদের তীরে তাঁর দাহ সম্পূর্ণ করা হয়।

স্মরণীয় বিচার সংগ্রহের ঘরের একটি কাচের বাক্সে কয়েক টুকরো টেলিগ্রাম, মেসেজ ও অন্যান্য কাগজপত্র ছিল যেগুলি দায়রা আদালতে দাখিল করা হয়েছিল।

ওয়ার্নি স্টেশনের কাছে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তারের পর একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল ওয়ার্নি থেকে মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারকে।

এই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিল কনেস্টেবল এস. মিশির ও ফতে সিং। টেলিগ্রাম তারিখ ছিল ১-৫-১৯০৮।

টেলিগ্রামটিতে লেখা ছিল,

WARNI

"Thunder accused with arms caught here."

সব লেখা ভালভাবে বোঝা যায়নি। এই টেলিগ্রামটি ছিল মামলায় ২নং একজিবিট।

প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহটি মোকামা থেকে মজঃফরপুরে আনার ব্যাপারে একটি টেলিগ্রামের হদিস্ পাওয়া গিয়েছিল। টেলিগ্রামটি দায়রা আদালতে সরকার পক্ষ থেকে দাখিল করা হয়েছিল। টেলিগ্রামটির একজিবিট নম্বর ছিল ৫২। টেলিগ্রামটিতে তারিখ ছিল ৩-৫-১৯০৮। সময় ১২-৫০ মিনিট। টেলিগ্রামটি ছিল এইরকম :—

Ext–52

Mokama Telegram
To
Supdt. of Police
Mujjaffarpur.

Bringing body Mujjaffarpur under commissioner's order for identification by accd .... be ready at station with accd. and Magistrate. Also bring Surgeon–ice and spirit for preservation of body.

S. Police

একটি মেসাজের এক টুকরো কাগজ ছিল এই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে।

MESSAGE

To,

S. Police,

Wire immediately what to do with dead body.

Sd/-

A. S. I.

একজিবিট 'K' তে লেখা ছিল

Calcutta Police

Form no. 594-A
Calcutta Police

Office

20-4-1908

My dear Armstrong,

The C.I.O. Bengal have heard a rumour. It is a pretty strong rumour, but there are absolute, no details and no facts, that a man probably a Bengali and probably a Bengali strong man left Calcutta.

সমগ্র বিচারপর্ব থেকে ভালভাবেই বোঝা গিয়েছে ১৮/১৯ বছরের যুবক ক্ষুদিরামের আইন সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সরকারপক্ষের সাক্ষীদের কি ভাবে জেরা করে তাদের বে-কায়দায় ফেলতে হয় সেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ক্ষুদিরামের ছিল না। সরকারপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষীর কাঠগড়ায় পেয়েও ক্ষুদিরাম বিনা জেরায় তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম হঠাৎ মিঃ কেনেডির গাড়ির কোচম্যানকে এলোমেলোভাবে জেরা করতে শুরু করেছিলেন। এই ধরনের এলোমেলো জেরা করতে শুরু করায় দায়রা বিচারক ভীষণ বিরক্ত বোধ করেছিলেন। তিনি ক্ষুদিরামকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, সাক্ষীকে জেরা করতে হয় এমনভাবে যাতে তার সাক্ষ্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করা যায়। আসল জায়গা থেকে সরে গিয়ে অনাবশ্যক জেরা করলে ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ক্ষুদিরাম বিচারকের বিরক্তি বুঝতে পেরে আর কোন সরকারপক্ষের সাক্ষীকে প্রশ্ন করেননি। ক্ষুদিরাম হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন প্রশ্ন করেই বা কি লাভ হবে তাই নিজেই সব ঘটনাব কথা স্ব-ইচ্ছায় স্বীকার করে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির খবর শহরে. গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল। এই বীর যুবকের দেশের জন্য প্রাণ বলিদানে অগ্নিপথের যাত্রীরা বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন। ভয়কে জয় করতে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তাদের শিখিয়ে গিয়েছেন মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তিতে ভয় পেলে চলবে না। অগ্নিপথে বিপদ থাকবেই সেই বিপদসঙ্কুল পথেই তাদের চলতে হবে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে দেশের মানুষের ঘৃণা আরো বেড়ে গিয়েছিল ইংরেজ প্রশাসনের ওপর। দলে দলে শিক্ষিত যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী বিপ্লবী দলে যোগ দিচ্ছিল প্রাণের মায়া ত্যাগ করে।

ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে যিনি গেয়ে গেলেন জীবনের জয়গান তাঁকে কি ভোলা যায়!

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ছিলেন অগ্নিপথের যুবক-যুবতীর কাছে অনুপ্রেরণা। এক মৃত্যুহীন প্রাণ!

ক্ষুদিরামের দীক্ষা গুরু সত্যেন্দ্রনাথ বোসকেও গলায় পরতে হয়েছিল ফাঁসির দড়ি। কানাইলাল দত্ত জেলের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেছিলেন বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে। তাঁকেও ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হয়েছিল।

বিচারের সময় জজ সাহেব কৌতূহলবশত কানাইলালকে প্রশ্ন করেছিলেন, জেলের মধ্যে তুমি আগ্নেয়াস্ত্র পেলে কেমন করে?

বীর বিপ্লবী কানাইলালের অকপট উত্তর ছিল—ক্ষুদিরামের আত্মা আমাকে দিয়ে গিয়েছে পথের কাঁটা সরাতে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর তাঁকে উদ্দেশ করে কবিয়াল বেঁধেছিল কবি গান, ভাটিয়াল গেয়েছিল ভাটিয়ালী, পল্লীবাসী গুন গুন করত পল্লীগীতি।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর একাধিক ইংরেজ আমলাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের আঘাতে।

ক্ষুদিরামকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবকে রোখা যায়নি।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির খবর স্বদেশী পত্র-পত্রিকাগুলি ফলাও করে প্রকাশ করেছিল। অগ্নিরোষ তৈরি করেছিল দেশপ্রেমিকদের মনে। 'বন্দেমাতরম্' আওয়াজ উঠেছিল দিকে দিকে। বাঙালির গর্ব ক্ষুদিরাম, বাংলার গর্ব ক্ষুদিরাম, ভারতবাসীর গর্ব ক্ষুদিরাম, বিপ্লবীর গর্ব ক্ষুদিরাম, স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর ভূমিকা কখনই ভোলা যাবে না।

অজ্ঞাত লোককবির সেই গান বাংলার মানুষ বোধহয় আজও ভুলতে পারেননি।

ক্ষুদিরামের কথা বলতে গেলে সেই গানটির কথা কি ভাবে যেন এসেই যায়।

গানটি আবেগে ভরপুর। বহুবার শোনা গানটি না হয় আরো একবার তুলে ধরা যাক্।

একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।
আমি হাসি হাসি পরবো ফাঁসি,
দেখবে ভারতবাসী।।
কলের বোমা তৈরি করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে, মাগো,
বড়লাটকে মারতে গিয়ে, মা
মারলাম আর এক ইংলন্ডবাসী।।

হাতে যদি থাকতো ছোরা,
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা?
রক্ত গঙ্গা বয়ে যেত, মা,
দেখতো জগৎবাসী।।
থাকতো যদি টাট্টু ঘোড়া,
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা?
ওমা, এক চাবুকে চলে যেতাম
গয়া গঙ্গা কাশী।।
শনিবার বেলা দশটার পরে
জজ কোর্টেতে লোক না ধরে, মাগো,
হল অভিরামের দ্বীপ চালান, মা,
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।।
বারোলক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইলো মা তোর বেটা-বেটি, মাগো,
তাদের নিয়ে ঘর করিস্ মা,
মোদের করিস্ দাসী।।
কাচের বাসন কাচের চুড়ি
পরো না মা, বিলাতি শাড়ি,
ওমা, মনের দুঃখ মনেই রইলো,
হলো না আমার স্বদেশী
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে, মাগো,
তখন চিনতে যদি না পারিস্, মা,
দেখবি গলায় ফাঁসি।।

অহিংসপথের যাত্রীরাও কিন্তু ক্ষুদিরামের মত বীর বিপ্লবীর তারিফ করেছিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হয়েছিল ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন অরন্ধনও উপবাস। তদানীন্তন ইংরেজ প্রশাসনও হয়ত অনুমান করে থাকবেন বাংলার যুবক-যুবতীর বুকে জমা চাপা ক্ষোভ।

দেশপ্রেমিকরা অস্বীকার করতে পারেননি ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে নির্ভীক আত্মবলিদানের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভয় ভাঙিয়ে দিয়ে গেলেন, জাগ্রত করে গেলেন বন্দেমাতরম্ মন্ত্র!

গলা মিলিয়ে স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের আওয়াজ তোলা উচিত—ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী, আমরা তোমাদের ভুলিনি, ভুলব না।

॥ ৮ ॥

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরেই সশস্ত্র বিপ্লবীরা ইংরেজ নিধনে মেতে ওঠেন। ১৯০৮-০৯ সালে বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে বিচার করা হয় ৩৭ জনের। এদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি সরকার, বীরেন সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ, নিরাপদ রায়, অশোক নন্দী, সুশীল সেন, বালকৃষ্ণ হারিকানে, কৃষ্ণজীবন সান্যাল প্রভৃতি। এদের মধ্যে দায়রা আদালত বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে দিয়েছিলেন প্রাণদণ্ড। পরে আপিলে ফাঁসির আদেশ মকুব করে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। শ্রীঅরবিন্দ-সহ ১৭ জনকে অবশ্য মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

১৯১০ সালে 'হাওড়া গ্যাং কেসে' অভিযুক্ত করা হয় ননীগোপাল সেনগুপ্ত, বিষ্টুপদ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বোস, নিবারণচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র দত্ত, শরৎচন্দ্র মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, শিবু হাজরা, হরিপদ অধিকারী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আনন্দপ্রসন্ন রায়, বিমলাচরণ দেব, কালিপদ চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী সরকার, হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুটান মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, চুনীলাল নন্দী, ভূষণচন্দ্র মিত্র, রামপদ মুখোপাধ্যায়, অতুল পাল, যোগেশ মিত্র, গণেশ দাস, শৈলেন দাস, রানী ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য। তিনকড়ি কর, মন্মথ বিশ্বাস, শিরিষচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

বিধুভূষণ বিশ্বাস, বিনয় চক্রবর্তী, দাশরথি চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী, কার্তিক দত্ত ও আরো অনেককে।

১৯১০ সালে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার হয়েছিল বিপ্লবী অবনীভূষণ চক্রবর্তী, বিধূভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বোস, নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, কালীদাস ঘোষ, শচীন্দ্রলাল মিত্র, নগেন্দ্র সরকার, সুধীরকুমার দে, প্রিরো ওরফে কিনু, ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিত্র ও মন্মথনাথ মিত্রের।

নানা মামলায় অগ্নিপথের যাত্রীদের ভোগ করতে হয়েছিল কারাদণ্ড।

সকলের কাছেই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ছিলেন অনুপ্রেরণা। আমরা যেন ওদের ভুলে না যাই